প্রসঙ্গ ঃ লোকমাধ্যম

সম্পাদনা

সঞ্জীব সরকার

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

সংযোগ–সংক্রমণ ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

সামাজিক প্রতিক্রিয়ার নিদর্শণ ও সংযোগ-মাধ্যমের অভিধায় লোক-সংস্কৃতি বা লোকমাধ্যম এক সুনির্দিষ্ট বিভাগরূপে সুচিহ্নিত বিষয়। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সংযোগ-মাধ্যমের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির কার্যকর ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত হলেও, এই সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের দেশে বিরল। বাংলায় সংযোগবিদ্যার সুনির্দিষ্ট চর্চার সূত্র-পাতের ক্ষেত্রে একালের বিনয় ঘোষ ও ফাদার রবের্জ-এর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিদ্যা-সম্পর্কিত আলোচনার সংগঠন ও বাংলা গ্রন্থাদি প্রকাশে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—চিত্রবাণী উইলিয়াম কেরী স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার, সেণ্টার ফর কম্যুনিকেসন এ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাকসান, উত্তরবঙ্গ লোকযান প্রভৃতি সংস্থার উদ্যোগের কথা। ভারতীয় ভাষা পরিষদে (৩৬এ, সেক্সপীয়র সরণী. কলকাতা ৭০০০১৭ সেণ্টার ফর কম্যুনিকেসন এ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাকসান আয়োজিত "Consultation on Role of Folkmedia in Communication"—বিষয়ক আলোচনা সভা লোকমাধ্যম ও সংযোগ-প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণা—অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বর্তমান আলোচনার অনুসঙ্গে প্রথমেই বহুপ্রচলিত ইংরেজী "কম্যু-নিকেশন", "মিডিয়া", "মাস মিডিয়া" ও "ফোক মিডিয়া" শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আমরা সাধারণভাবে কম্যুনিকেশন অর্থে সংযোগ, মিডিয়া অর্থে মাধ্যম, মাস মিডিয়া অর্থে

জনমাধ্যম (গণমাধ্যম নয়) ও ফোক মিডিয়া অর্থে লোকমাধ্যম প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারি। মাস মিডিয়া অর্থে সাধারণতঃ গণমাধ্যম শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। আমাদের দেশীয় পরিবেশ, জাতীয় পরিস্থিতি ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির কথা স্মরণে রেখে লোকসংস্কৃতির অভিধায়— Popular Culture অর্থে লোকপ্রিয় সংস্কৃতি, Peoples Culture অর্থে গণসংস্কৃতি এবং Mass Culture অর্থে জনসংস্কৃতি শব্দত্রয় ব্যবহার করা যায়। দেশপ্রেমের আবেগ বা সংগ্রামী চেতনায় প্রবর্তণায় উদ্দীপ্ত গণজাগরণের সংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, সচেতন রাজনৈতিক মনন-প্রয়াসে যার উদ্ভব।

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জনমাধ্যম (Mass Media) সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষভাবে গণসংস্কৃতি (Peoples Culture) ও জনসংস্কৃতির (Mass Culture) প্রত্যয়জাত পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক। জন মাধ্যম প্রচারিত ও সংগঠিত "জনসংস্কৃতি" এবং জনগণের সচেতনতা সমৃদ্ধ "গণসংস্কৃতি" এক নয়। শ্রেণীহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় জন মাধ্যম-প্রসারিত সংস্কৃতি ভিন্ন তাৎপর্যে সমৃদ্ধ হয়ে গণসংস্কৃতির অভিমুখীন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু শ্রেণীশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় জন মাধ্যম প্রবর্তিত সংস্কৃতি জন সংস্কৃতি রূপেই বিবর্তিত হয় এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোষক শ্রেণীর স্বার্থপুষ্ট হয়ে প্রকৃত গণস্বার্থ বিমুখ-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাই মাস-মিডিয়াকে গণমাধ্যম না বলে, জনমাধ্যম বলাই যুক্তিযুক্ত। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সংস্কৃতির ন্যায় সংযোগ-মাধ্যমের শ্রেণী-চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রগতিশীলতার প্রতীক হয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণ-অভিমুখীন সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থীরূপে ব্যবহৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সচেতন হয়ে সংযোগ-প্রক্রিয়ায় মাধ্যমের প্রসঙ্গে ''Mass Media'' কে "জনমাধ্যম" বলাই শ্রেয়।

সংযোগের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তার ব্যাপ্তি নিসর্গ প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও মনুষ্যসমাজের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ও বিষয়ানুসারে সংযোগপ্রক্রিয়ার রূপভেদ হয় এবং বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সংযোগ মাধ্যমের রূপান্তর ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভ্রান্তি-বশতঃ মনে করি যে মানুষের ভাব-বিনিময় প্রথা শিক্ষার সঙ্গেই মানুষ সভ্য হয়েছে এবং ভাব-বিনিময় ও সভ্যতা সমবয়সী। কালের বিবর্তনে জনসংযোগের চরিত্র বদল হলেও মানুষের ভাব-বিনিময় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সভ্যতার উদ্ভবের সংযোগ-কল্পনা সমাজবিজ্ঞান বিরোধী চিন্তার ফল। কারণ, সমাজবিজ্ঞানীগণ জানেন মানবেতর পশুজগতেও সংযোগপ্রক্রিয়া কোন-না-কোন ভাবে সাধিত হয়। বিশেষজ্ঞগণ প্রকৃতির রাজ্যে, পশু-পক্ষীর জগতে ও মনুষ্য সমাজে সংযোগপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে থাকেন, এমন কি দেহের এক কোষ থেকে অন্য কোষে সংবাদ প্রেরণের DNA molecule) প্রক্রিয়ার স্বরূপ অনুধাবন করেন। সংযোগপ্রক্রিয়ায় Pre-Codification Communication Codified Communication. Inter-personal Communication—Group Communication, Semotic Communication Electronic Communication. Mass Communication—Folk Communication প্রভৃতির আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সংযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে অঙ্গভাষা—শব্দ ভাষা—চিত্র ভাষা—লিপি ভাষা এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানাশ্রয়ী মাধ্যমের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক অর্থে সংযোগ প্রক্রিয়ার মূল অবলম্বন তিনটি—"মেসেজ" বা বক্তব্য, "রিসিভার" বা গ্রহণকারী এবং "ফিড্ব্যাক" বা প্রত্যাগত সাড়া। বলা বাহুল্য ফিডব্যাক বা উপযুক্ত সাড়া পাবার মধ্যেই সংযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বা সার্থকতা নিহিত থাকে। সাধারণভাবে সংযোগকে বিচ্ছিন্নতা ও বিযুক্তির বিপরীত কোটির বিষয় হিসাবে মনে হলেও "যবে থেকে স্বাভাবিক সামাজিক যূথের প্রতিস্পর্ধী কোন প্রবণতা বড় বেড়ে

উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই সেতুবন্ধের সাধনা চলেছে"—এমন অনুমান সম্ভবতঃ সর্বোত সঠিক নয়। সংযোগ-বিজ্ঞানীগণ জানেন যে, কেবলমাত্র বিরোধাত্মক প্রক্রিয়ার বা Negative reaction থেকেই সংযোগের আর্তি সৃষ্টি হয় না, Possitive বা সদর্থক দিক থেকেও সংযোগের সেতুবন্ধন ঘটে। সংযোগ-সংক্রমণের সমস্যা ও সমাধানের পটভূমিতেই মাধ্যমগত প্রকৌশলের প্রয়োগগত যাথার্থ্যের মূল নিহিত থাকে।

সংযোগের সর্বজনীনতা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে লোকায়ত চরিত্রের সমানুপাতের সম্পর্ক কল্পনা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না এবং তার সঙ্গে নাগরিকী ভবনের সম্পর্ক সমার্থে জড়িত বলে অনুমান করার সংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। গ্রাম-নগর নির্বিশেষে যেমন সংযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে তেমন সর্বজনীনতা নাগরিকতা, নিরপেক্ষ ভিন্নতর প্রয়োগপ্রকরণে লৌকিক বৈশিষ্ট্যের মৌলিকতা ভ্রষ্ট হতে পারে। মোটের উপর সংযোগ প্রক্রিয়ায় সর্বজনীনতা নাগরিকতা প্রভৃতিকে এক মনে করা কার্যতঃ সংযোগ বিদ্যা ও লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিপন্থী। তা ছাড়া সংযোগ মাধ্যম হিসাবে লোক সংস্কৃতির উপকরণগুলি বিশেষরূপে বিদ্রূপেরই রূপ গ্রহণ করে এমন নয়। লোকসঙ্গীত, লোকাভিনয় প্রভৃতি লোক মাধ্যম বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকানুসারে বিভিন্ন প্রকার রসরূপ লাভ করে থাকে, তা একান্তভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুগামী নয়। এদিক থেকে ভাদু, তুষু, বোলান প্রভৃতি লোকমাধ্যমগুলির কথা স্মরণযোগ্য। সব শেষে বলা যায়, প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরী বিদ্যার প্রসারে মাধ্যমের যন্ত্রবিজ্ঞানগত জটিলতা বা সূক্ষ্মতা দেখা দিলেও, মাধ্যমগুলির ব্যবহারিক প্রকাশ সর্ব ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম, জটিল ও পরিশীলিত হয়ে ওঠে না। উদ্দেশ্যানুসঙ্গে ও সংযোগের প্রক্রিয়ায় তা কখনও স্থূল, কখনও সূক্ষ্ম, কখনও জটিল—কখনও সরল রূপ পরিগ্রহ করে—এই সত্য লোকমাধ্যম সহ সর্বপ্রকার সংযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রামীণ প্রথাগত মাধ্যম বা লোক মাধ্যমগুলি, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমা

প্রভৃতির তুলনায় আপাতঃ স্থূল হলেও, জনসংযোগের ক্ষেত্রে এগুলির প্রভাব অনেক বেশী সতেজ ও প্রত্যক্ষ। আধুনিক কারিগরী বিদ্যার দিক থেকে আবহমানকাল প্রচলিত গণমাধ্যমগুলি তথাকথিত স্থূল হলেও সংযোগ-সংক্রমণের ক্ষেত্রে লোকমাধ্যমগুলির সফলতা স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রশ্নাতীত। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লোকমাধ্যমই শ্রেষ্ঠ গণ-মাধ্যম।

মুদ্রাযন্ত্র, বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র চলচ্চিত্র ভি. ডি. ও. প্রভৃতি জন মাধ্যমগুলি মূলতঃ উপরিতলের সামাজিক কাঠামো আশ্রয়ী। বিপরীতক্রমে লোকসংস্কৃতিজাত লৌকিক মাধ্যমগুলি স্বকীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যে আপামর জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা নির্ভর। সংযোগের শ্রেষ্ঠতম উপায় কি তা বলা কঠিন। অভিজ্ঞতা ও বিবর্তনের পথে তা প্রতিভাত হবে, তবে লৌকিক প্রকাশ মাধ্যম যে সাধারণ জনসমাজে সর্বাধিক সংযোগ-সংক্রমণে সক্ষম এ দাবী নিঃসন্দেহে উত্থাপন করা যায়। বর্তমানে জন মাধ্যমগুলি শুধুমাত্র যন্ত্র নির্ভর যান্ত্রিক নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি মানবিক অনুভূতি ও মূল্যবোধকে নির্বাসিত করে। প্রমোদ ও স্থূল অবসর বিনোদন এবং ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি একালের জন মাধ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য। ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসারে একালের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীনিয়ন্ত্রিত জন মাধ্যমগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী গণবিরোধী মাধ্যমে পর্যবসিত। অবশ্য আধুনিক সংযোগ মাধ্যম বা জনমাধ্যম-সমূহ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে সার্বজনীন কল্যাণমুখী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আধুনিক জন মাধ্যমের সুষ্ঠু ও সুস্থ ব্যবহারের প্রশ্নটিই সর্বাগ্রে বিবেচনার যোগ্য।

আধুনিক জনমাধ্যম সমূহের প্রচণ্ড গতিশীলতা ও সংযোগ-সংক্রমণের কার্যকারিতার ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী। আধুনিক কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যার সর্বোন্নত প্রকরণ সমূহের যথাযথ ব্যবহারে জন মাধ্যম সমূহ সামগ্রিকভাবে সংযোগ প্রক্রিয়ায় জনকল্যাণ সাধন করতে পারে এবং সংযোগগত দূরত্বের অবসান ঘটাতে পারে। প্রচলিত জন মাধ্যমের বিকল্প মাধ্যম হিসাবে লোক সংস্কৃতি ভিত্তিক লোকমাধ্যমের কথা বিবেচনা করা যায়। সংযোগ-প্রক্রিয়ায় লোক মাধ্যমের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সংযোগপ্রক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতির অবস্থান ও চরিত্র বিশ্লেষণ আধুনিক কালে সংযোগ বিদ্যার অন্যতম প্রধান অন্বেষা। লোক মাধ্যম লোক সাধারণের নিজস্ব মাধ্যম, ঐতিহ্য-উৎসারিত হয়েও তা সদা চলমান এবং জনজীবনকে অঙ্গীকার করে নিয়েই তার সম্ভাব্য বিস্তার।

লোকসংস্কৃতির প্রথাগত মাধ্যমের দ্বারাই সংযোগের স্বতঃস্ফূর্ত সেতুবন্ধন সম্ভব। লোকসংস্কৃতি জন্মসূত্রে সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই লোকসংস্কৃতি সমষ্টি-উচ্চারণে সমৃদ্ধ। লোকসংস্কৃতি শুধুমাত্র সমষ্টিগত সৃষ্টি নয়, তার উপভোগের ব্যাপারটিও মূখ্যতঃ যৌথ। লোকসংস্কৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরিবেশক ও শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যে ব্যবধান প্রায় থাকেই না। শ্রোতাকে আনন্দিত, শোকার্ত, উত্তেজিত, উদ্বেলিত করতে লোকসংস্কৃতির তুলনা নেই। ঐতিহ্যলালিত লোক মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জন্মগত ভাবে অভ্যস্ত থাকে বলেই সংযোগের ক্ষেত্রে লৌকিক উপাদান-উপকরণের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষকে

অন্তরঙ্গ করে নেয়। সংযোগের সূত্রে লোকসংস্কৃতির স্বকীয়তা ও প্রভাব জনচিত্তে একান্তই প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক। উচ্চসংস্কৃতিগত মাধ্যমের ন্যায় তা ছিন্নমূল মনন-সাপেক্ষ নয় ঐতিহ্যের দৃঢ়মূল স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ সংক্রমণে সক্ষম-বিশিষ্ট প্রকরণ। মার্কসীয় তত্ত্বের দৃষ্টিতে বলা যায় লোকসংস্কৃতিগত লোক মাধ্যম সমাজ-পরিবর্তনের প্রযত্নের অনুসঙ্গী এবং বৈপ্লবিক কর্মোদ্যোগের সহায়ক। সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের সাথে লোকায়ত মানুষের বা লোকসংস্কৃতির কোন বিরোধাত্মক সম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখনই যখন তা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-রূপে নিয়ন্ত্রিত বা ব্যবহৃত হয়। যুগ-পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তনে লোকসংস্কৃতি বা লোক মাধ্যমের চরিত্রের অঙ্গহানি ঘটে না। সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় সর্বপ্রকার লোক মাধ্যমই যে সমভাবে বেঁচে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই। অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি বা লোক-মাধ্যমের অনেক বিষয় স্বাভাবিক ভাবেই লুপ্ত হতে পারে বা "মিউজিয়াম পিস্" হয়ে থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষীদের অপব্যবহারে লোকসংস্কৃতির মৌলিক লোকচরিত্র ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু স্বীয় প্রাণ-শক্তি ও সুস্থ পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবে লোক চরিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও বিবর্তন সম্ভব।

লোকসংস্কৃতির আবেদন মুখ্যতঃ গ্রাম্য ও অশিক্ষিত জনচিত্তে এমন মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। পৃথিবীর সর্বত্র সংযোগ সংক্রমণে সর্বাধিক আধুনিকতার আধিপত্যের পাশাপাশি লৌকিক দাবীর ক্রম-

প্রাধান্য বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ রূপে লক্ষ্য করে থাকেন। সংযোগের ক্ষেত্রে লোক মাধ্যমের লোকরঞ্জন ও জনশিক্ষার ভূমিকা বা সক্রিয়তার প্রসঙ্গ আজ প্রশ্নাতীত। সংযোগের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির দ্বিবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—আধুনিক সংযোগ মাধ্যমের অন্তর্গত বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার এবং বিকল্প সংযোগের প্রত্যক্ষ মাধ্যমরূপে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার। শ্রোতা ও দর্শকের সঙ্গে সংযোগ সংক্রমণের সার্থকতার জন্য লোক প্রচলিত মাধ্যম বা উপকরণে নানা প্রকার পদ্ধতি বা প্রকরণের নবতর অঙ্গীকার ঘটে দেশ কালের বাস্তবতায়। এই ভাবে লোকসংস্কৃতি বা লোক মাধ্যম চলমান কালের মতো উদ্ভাসিত হয়ে আবহমানকাল সংযোগ-সংক্রমণে সার্থকতার দিশারী হয়ে চলে।

মাধ্যমগত প্রকৃতি বিচারে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির সংবাদ-মুখীনতার দিকটি বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদজাতীয় বিষয় পরিবেশিত হয়, তা বলে সেগুলি সাংবাদিকতার নিদর্শন হয়ে ওঠে না। লোক সাংবাদিকতা লোকসাহিত্যের না সাংবাদিকতার অঙ্গ তা বিচার্য। লোকসাহিত্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ ফাংশান বা কার্যকারিতা, যার মধ্যে সংবাদ পরিবেশন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অন্যতম প্রধান। লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির এইরূপ সংবাদ সংযোগ সংক্রমণের কার্যকারিতা বিশিষ্টার্থে লোকসাংবাদিকতা নয়। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যে ভাবেই হোক না কেন, লোকসংস্কৃতির মধ্যে নানা প্রকার সংবাদমূলক বিবরণ বিবৃতি থাকতে পারে এবং তা সংযোগ কার্য সাধন করতে পারে। লোকসংস্কৃতির এই দিকটি বিশিষ্টার্থে ফাংশান বা কার্যকারিতার দিক, লোক সাংবাদিকতা নয়। লোক সংস্কৃতির নিজস্ব

নিয়মে টুসু. ভাদু. ঝুমুর, গম্ভীরা, আলকাপ, বোলান, চোরচুরনী, মেছেনী, খণ. সঙ ময়ুরপঙ্খী, ছড়া, কবিগান, ছো নাচ, পটচিত্র প্রভৃতির মধ্যে নানা ভাবে বাস্তব বিষয় ও ঘটনাদি প্রতিফলিত হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বাৎসরিক সালতামামী রূপ পরিগ্রহ করে সত্য, কিন্তু সেগুলি লোক-সঙ্গীত, লোকনাট্য, লোকশিল্প, লোকসাহিত্যাদি রূপে পরিগণিত হয়, লোকসাংবাদিকতা হিসাবে নয়। সংবাদমূলক বা সাংবাদভিত্তিক রচনামাত্রই যেমন সাংবাদিকতা নয়, তেমন সংবাদ পরিবেশক, লোকসঙ্গীত, ছড়া. লোকাভিনয় মাত্রই লোক-সাংবাদিকতা নয়। রাজনৈতিক সাংবাদিকতা, শিল্পগত সাংবাদিকতা, শিক্ষাগত সাংবাদিকতা, গ্রামীণ সাংবাদিকতা. ক্রীড়া সাংবাদিকতা প্রভৃতির ন্যায় লৌকিক সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতা শাস্ত্র বা কার্যের একটি শাখা, প্রত্যক্ষরূপে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয়। সংবাদপত্রের লক্ষণ বা সাংবাদিকতার ধর্মসমূহ লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে বিশেষভাবে অনুসৃত বা প্রতিপালিত হয় না, তাই এগুলিকে লোক-সাংবাদিকতা নামে বিশেষ অভিধায় অভিহিত না করাই বিধেয়। লোক-সংস্কৃতির মধ্যে সংবাদ পরিবেশিত হয়, এবং সংযোগের ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতিকে নানা ভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয় সত্য, কিন্তু লোক-সংস্কৃতি বিজ্ঞানের পরিভাষায় তা লোকসংস্কৃতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগগত কার্যকারিতার দিক তথা **Applied or Functional aspect of Folklore.**

বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশের মাধ্যম সংযোগ-বিষয়ক আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের জন-সমাজের বৃহত্তম অংশ আজও গ্রাম্য জীবনধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সাক্ষরতা ও

দারিদ্র সীমার নিদারুণ নিম্নাঙ্কে তাদের অবস্থান। এই জনগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশে মাধ্যম ও বার্তার যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের দেশে সংযোগদাতা ও বার্তাগ্রহীতার মধ্যে ব্যবধান ঘোচেনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা সজীব হয়ে ওঠেনি। অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি বশতঃ যথাযোগ্য ভাবে সংযোগ-সাধনের ক্ষেত্রে অন্তরায় ঘটেছে এবং ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ হারানোর ভীতিতে সাধারণ জনসমাজ দূরে সরে গেছে। মাধ ম ও বার্তা যথাযথ ব্যবহারের অভাবই সংযোগের কার্যকারিতাকে সংকুচিত করেছে বিভিন্ন ভাবে। একালের প্রচলিত জনমাধ্যমগুলি বহু দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ও রমণীয় হলেও, প্রচলিত লৌকিক জীবনধারার সঙ্গে তার একাত্মতার অভাব সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ডেকে এনেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে অদ্যাপি সংযোগ ব্যাপারটি মুখ্যতঃ পুরাতন ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে "Topdown process or vertical mode of Communication" তথা উপর থেকে নিচু তলায় সংক্রমণের বা চুঁইয়ে পড়া পদ্ধতিতে থেকে গেছে। সংযোগের এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য উদ্দেশ্যানুসঙ্গে প্রয়োজন "Horizontal mode of Communication" বা প্রলম্বিত সংযোগ সংক্রমণ পদ্ধতির সুবিস্তার। আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন স্থানীয় জীবনধারা ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, যা বার্তাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মুখোমুখী জীবন্ত পরিবেশ (Face to face living situation) সৃষ্টি করতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংযোগ-ক্রিয়াকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করতে পারে।

বিজ্ঞান ও মনন সাধনতার অগ্রগতির সঙ্গে সমাজ পারিপার্শ্বিকের

পরিবর্তনমুখীনতায় সংযোগ-সংক্রমণের মাধ্যম ও উপাদানের বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু জনচিত্তে মৃত্তিকাশ্রয়ী লোকমাধ্যমের আবেদন ও সক্রিয়তা যে সর্বাধিক সার্থকতামুখী এ তথ্য প্রমাণিত সত্য। তাই সংযোগমাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন লোকায়ত মাধ্যম ও কাঠামো সমূহের সম্যক্ ব্যবহার। এই ব্যবহারের জন্য লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানগত আত্মপ্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। লৌকিক মাধ্যমের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়িক - সৌখীন ও অদীক্ষিত প্রয়াস পরিহার। সংযোগ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ এবং বিষয়বস্তুগত ও মাধ্যমগত দিক থেকে লৌকিক উপাদান সমূহের যথাযথ প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও সংযোগ বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রয়াস আবশ্যক। তাই বলা যায়—"In Communication mechanism Collaboration of Folklorist and Media people may yield very encouraging and effective result" লোকসংস্কৃতিবিদ্ ও সংযোগবিদের যৌথ সহায়তায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকসমাজই সংযোগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য এই বিষয়টি অত্যন্ত সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সংসাধিত হওয়া প্রয়োজন. অন্যথায় তা লোককৃতি বা লোকসংস্কৃতির (Folklore) পরিবর্তে লোকবিকৃতির (FAKELORE) আধার হয়ে উঠতে পারে। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার উন্নয়নের বার্তা বা প্রকল্প সমূহ ঐতিহ্যগতভাবে জনসাধারণের সচেতনাকে সমৃদ্ধ করতে ও গণউদ্যোগ

উন্মুক্ত করতে সফলকাম হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় সংযোগ-সক্রিয়তার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিগত মাধ্যমসমূহ নিঃসন্দেহে আধুনিক জনমাধ্যম সমূহের সার্থক ও অত্যাবশ্যকীয় পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত ও ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সংযোগের গণচরিত্র বিকাশ সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই সংযোগমাধ্যমের অনুশীলনে ও ব্যবহারে তৎপরতা প্রয়োজন। ▭

সভাপতির ভাষণ অবলম্বনে লিখিত ও প্রকাশিত

সঞ্জীব সরকার

সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সংযোগ-সমস্যা

আমরা এক পৃথিবীতে বাস করি, কিন্তু আমাদের অবস্থান দুই মানচিত্রে। এক মানচিত্রে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যাবতীয় চিহ্ন বর্তমান, অন্য মানচিত্রে দারিদ্র ও ক্ষুধার মহাসাগর। আজকাল অবশ্য কেউ কেউ পৃথিবীকে তিনটি মানচিত্রে বা মেরুতে ভাগ করেন। সে যাই হোক, আমাদের অবস্থান যে মানচিত্রে বা মেরুতে সেখানে অভাব, দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও শোষণই আমাদের নিত্যসঙ্গী।

সমৃদ্ধ প্রথম বিশ্বই হোক আর অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বই হোক সমাজটা হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তারা আরও পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে। তাদের আধিপত্যের হাত প্রসারিত হচ্ছে প্রথম বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্ব পর্যন্ত সারা জগতে।

এ যুগ হচ্ছে টেকনোলজির যুগ। একথা বলা হয়ে থাকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে মানবসভ্যতা এখন এক শীর্ষতম পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, যে টেকনোলজির দৌলতে মানবসভ্যতার এতো রমরমা, সে টেকনোলজি কাদের হাতে, কারা সেটা ব্যবহার করতে পারে।

অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক আধিপত্য যাদের হাতে তারাই স্বাভাবিক কারণে তাকে ব্যবহার করতে সক্ষম। তাহলে সভ্যতার চাবিকাঠি কি তাদেরই হাতে যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, অথচ অপরিমেয় শক্তির অধিকারী? আর যারা সংখ্যায় অগণ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ

ক্ষমতাবঞ্চিত, শোষিত, নিচের তলায় পড়ে থাকা এই মানুষগুলির সভ্যতা সৃষ্টিতে কি কোন অবদান নেই ?

একথা আজ মনে রাখা দরকার, যারা টেকনোলজির ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে তারাই নিয়ন্ত্রিত করছে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক গণ-মাধ্যম "মাস-মিডিয়া" নামে যা পরিচিত।

পৃথিবীকে পদানত ও জনগণেশকে স্বপক্ষে আনার জন্যে ব্যাপক প্রচার ও মগজ ধোলাই আবশ্যক। এই কাজে "মাস-মিডিয়া" হচ্ছে উপযুক্ত হাতিয়ার। এই জন্যেই টেলিভিশন, রেডিয়ো, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র এই সব আধুনিক গণ-মাধ্যমগুলিকে তারা কব্জা করে রেখেছে। এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে তারা তাদের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, রুচি, আচার-আচরণ জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণীয় করে ছড়িয়ে দেয়। সৃষ্টি করে এমন প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা, যাতে তাদের কারখানার উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যগুলি বিকায়।

এই ভাবে তারা সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করে এক ভোগবাদী সংস্কৃতির (Consumer Culture) পত্তন করে। সংস্কৃতি হয় পণ্য বিক্রয়ের হাতিয়ারে পরিণত। সুস্থ সংস্কৃতি, জনগণের সংস্কৃতির অবনয়ন ঘটায়। সমাজ রূপান্তরের জন্যে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে বিপথগামী করে।

বিশ্বকে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করার ক্ষেত্রে বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মুখ্য ভূমিকা আছে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, পৃথিবীর ছয়টি বহুজাতিক সংস্থা পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সংবাদপত্র এখন তাই সংবাদের চেয়ে বিজ্ঞাপনের বাহন হয়েছে। আমেরিকা মহাদেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, কাগজের আশি ভাগই পূর্ণ হয় নানা চটকদারী বিজ্ঞাপনে। মাত্র ২০ ভাগে থাকেসংবাদ। বলা বাহুল্য মাত্র সে সংবাদ সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা সংক্রান্ত নয়।

টেলিভিসনের প্রভাব আজকাল প্রচণ্ডভাবে পড়েছে, বিশেষতঃ মূল্যবোধ ও প্রত্যাশার ক্ষেত্রে। বহুজাতিক সংস্থার বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এই টিভি। এর মাধ্যমেই ভোগবাদী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটছে।

টিভি-র প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের যুবসমাজ ও শিশুদের উপর কি ভয়াবহ ভাবে পড়েছে, তার সমীক্ষাও অনেকে করেছে।

আসলে বহুজাতিক বিজ্ঞাপন সংস্থা ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলি এই তথাকথিত মাস-মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। গণ-মাধ্যমগুলি বর্তমান সমাজব্যবস্থায় তাই হয়েছে গণ-বিরোধী মাধ্যম।

বিজ্ঞান ও টেকনোলজীর নতুন নতুন আবিষ্কার এই গণ-বিরোধী মাধ্যমকেই মদত দিয়ে যাচ্ছে। তারই দৌলতে গণ-মাধ্যমগুলি বিশ্বের বুকে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। টেকনোলজিও ব্যবহৃত হচ্ছে মানব সমাজের সর্বনাশ ঘটাবার কাজে। লোকসমাজের ভিত্তি ছিল পারস্পারিক আদানপ্রদান ও ভাব বিনিময়, তা লোপ পেয়ে গেছে। একমুখী গণ-মাধ্যমে পারস্পারিক আদানপ্রদানের স্থান নেই, স্থান নেই জনগণের সৃজনশীলতার। মুক্তিদায়ী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মাসমিডিয়া নীরবতার সংস্কৃতির উদ্গাতা।

মাস-মিডিয়া নিয়ে বিভিন্ন দেশের যে বিশ্লেষণ হয়েছে, তাতে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, বর্তমান কালে মাস-মিডিয়ার সঙ্গে টেকনো-লজির অশুভ মিলনের ফলে বিশ্বের বুকে অমিতপরাক্রমশালী এক বহু স্তর বিশিষ্ট দুষ্ট চক্রের সর্বব্যাপী (Polyhedron) জন্ম হয়েছে। যার সঙ্গে যুক্ত আছে বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী, মাথায় বসে আছে ইলেকট্রনিক ও নিউক্লিয়ার ইণ্ডাষ্ট্রি—যাকে চালনা করছে বহুজাতিক সংস্থা ও সামরিক শক্তি। এই মহাচক্রের প্রবল বাহু জালের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তার থেকে রেহাই নেই তৃতীয় বিশ্বের মানুষের। সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর হাতে এনে দিয়েছে বিপুল বৈভব ও ক্ষমতা।

এই সর্বব্যাপী দুষ্টচক্র যে কেবল রাজনৈতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেই

প্রভাব বিস্তার করেছে তাই নয়, এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে আরও গভীরে, মনোজগতেও পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে।

চতুর্থতঃ, প্রযুক্তিগত শক্তির সমাজের কাছে কোন দায়দায়িত্ব নেই, দৈনন্দিন জীবনে চালনা করার ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে এড়িয়ে চলে, তা সত্ত্বেও দেশ-কাল-পাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেকে কোনরকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে রেখে।

এই দিকগুলি বিশ্লেষণ করে একজন সমাজবিজ্ঞানী রায় দিয়েছেন—

প্রযুক্তিবিদ্যা এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যা অতি বিরাট ও জটিল, যাকে কেন্দ্রীয় ভাবে সুনিয়ন্ত্রিণ করা সম্ভব নয়, ব্যক্তিগতভাবেও নয়। এর ফলে এর বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এবং যেহেতু শিল্প-সভ্যতার সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গি যোগ, আজকের সমৃদ্ধ এই শিল্প-সভ্যতার (industrial civilization) অধঃপতন অনিবার্য।

এই অনিবার্যতার কথা সবাই হয়ত স্বীকার করে নেবেন না।

কিন্তু একথা অস্বীকার করতে পারবেন না, আমরা সভ্যতার এক বিপর্যয়কর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি।

প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান আজ যাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার মধ্যে চলে গেছে তারাই মানবসভ্যতাকে এই বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

সারা বিশ্বের এই পটভূমিতে আমাদের দেশের কথা বিবেচনা করতে হবে। এখানকার সংস্কৃতি ও সংযোগ মাধ্যম এক বিচিত্র ও জটিল প্রক্রিয়ার শিকার। দীর্ঘ ঔপনৈবেশিক শাসনের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি বাদ দিয়ে এখানে এক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পত্তন হয়েছে। এর পুরোধা হচ্ছে সহরাঞ্চলের এলিট শ্রেণী। এরা যে সংস্কৃতির উদ্গাতা তার মূল মন্ত্র এসেছে শিল্পোন্নত প্রথম বিশ্ব থেকে। প্রথম বিশ্বের 'শিল্পসভ্যতাকে' সার্বজনীন সভ্যতা, যুগের সভ্যতা বলে প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর যুগে আশির দশকে এসেও নিজস্ব সংস্কৃতি ও মাধ্যমকে অস্বীকার করে এই তথাকথিত প্রযুক্তি সভ্যতাকে অনুকরণ করে নিজেকে উন্নত করার প্রয়াস আরও জোরদার হয়েছে। দেশের

ধনিকগোষ্ঠী, বিশ্বব্যাপী দুষ্টচক্রের (Polyhedron) অঙ্গ হিসাবে তার বাহু বিস্তার করে চলেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সংযোগ মাধ্যমের ক্ষেত্রে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

আমাদের নেতারা সর্বদাই তথাকথিত উন্নত দেশের উন্নত কলা-কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানী করতে লালায়িত।

এতে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের আধুনিকীকরণ কি হয়েছে জানি না, কিন্তু বহুজাতিক সংস্থা ও সমর-শিল্পের ফলাও কারবার হয়েছে, তাদের কুটজাল আরও প্রোথিত হয়েছে এবং সমৃদ্ধশালী শ্রেণীর সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা আরও বেড়েছে। অপসংস্কৃতির জোয়ারে আজকের যুবসমাজ উন্নতজীবনের সংগ্রাম থেকে দূরে সরে গেছে।

ভারতের মাস-মিডিয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

এতোক্ষণ যা আলোচনা করা হোল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের মাস-মিডিয়াকে বিচার করা যাক।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই থাকে গ্রামে। এবং নিরক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশি। কাজেই লিখিত মাধ্যমের প্রচার সীমাবদ্ধ।

সারা ভারতে প্রায় ১৯ হাজার পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১০৩৪টি
এদের মোট প্রচার সংখ্যা ৫০ লক্ষের কিছু বেশি। এই সংখ্যার ৯৩ ভাগই বিক্রি হয় সহরাঞ্চলে। সমগ্র লোকসংখ্যার মাত্র ১০ ভাগ হচ্ছে এরা।

এই মুষ্টিমেয় ১০ ভাগ জনসমষ্টিই হচ্ছে তথাকথিত জনমতের নিয়ন্ত্রক। শিক্ষা ও সম্পদের ক্ষেত্রে এরাই পুরোভাগে। কাজেই সংবাদপত্রের প্রচার ব্যাপক না হলেও প্রভাব ও বিকাশ জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের মতো নিরক্ষর দেশেও সংবাদপত্র একটি শক্তিশালী মাস-মিডিয়া। তাই বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী,

তের

ক্ষমতাবান শ্রেণী ও রাজনৈতিকগোষ্ঠী সকলেই আপন আপন স্বার্থে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করতে সদাই তৎপর।

সংবাদপত্র আজ বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত। যার মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন, তার সঙ্গে জনমতকে আয়ত্তে রাখাও একটি উদ্দেশ্য। উন্নত দেশের মতোই সংবাদপত্র ক্রমশই বিজ্ঞাপনমুখী হয়ে উঠেছে, কারণ বৃহৎ শিল্প-বহুজাতিক ব্যবসায় সংস্থার অশুভ আঁতাত দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে।

আমরা বাংলা সংবাদপত্রের এক সপ্তাহের এক সমীক্ষায় দেখেছিলাম, ৪০ ভাগ থাকে সংবাদ আর ৬০ ভাগই বিজ্ঞাপনে ভর্তি। গতিটা কোনদিকে এতেই বোঝা যাবে।

সংবাদ যা থাকে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খবর যার সঙ্গে দেশের আশি ভাগ মানুষের কোন সংযোগ বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। সংবাদপত্রের খদ্দের তো সহরাঞ্চলের মাত্র ১০ ভাগ সুবিধাভোগী মানুষ। এই ১০ ভাগ লোকের কথাই বেশি স্থান পায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষ সারা দেশের ৮০ ভাগ তারা স্বভাবতই হয় অবজ্ঞাত। তাদের কথা তাদের জীবন তাদের খবর স্থান পাবে কেন ?

মাসমিডিয়ার সব চেয়ে প্রসারিত মাধ্যম হচ্ছে রেডিয়ো। প্রায় তিন কোটি রেডিয়ো সেটের মধ্যে ৮০ ভাগই হচ্ছে সহরাঞ্চলের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ। সমীক্ষায় প্রকাশ প্রায় ৬০ লক্ষ সেট আছে গ্রামাঞ্চলের ৫২ কোটি মানুষের। আমরা পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন গ্রামে সমীক্ষা করে দেখেছি মোট লোকসংখ্যার মাত্র ১৭ শতাংশের ট্রানজিস্টার আছে।

রেডিয়ো ষ্টেশনের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই এখানে। ভারত সরকারের একটি সংস্থা আকাশবাণী। কাজেই সরকারের বক্তব্য ও নীতি সরকারী নেতৃত্বের ভাবমূর্তি প্রচারের মাধ্যম হিসাবেই প্রধানত রেডিও ব্যবহৃত হয়। সরকারের শ্রেণী-চরিত্র এই মাধ্যমটির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট।

অন্যদিকে এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে বিজ্ঞাপন-সংস্থার প্রাধান্য। শ্রোতাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে হিন্দি চলচ্চিত্রের গান, ব্যবসায়ী সংস্থার প্রমোদমূলক নাটিকা, চুটকি, হাসি-মস্করা প্রভৃতি।

প্রমোদ-মাধ্যমের সাম্প্রতিক সংযোজন হচ্ছে টেলিভিশন। দিল্লী সহরে ১৯৫৯ সালে প্রথম টিভি চালু করে ভারত সরকার। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই নাকি টিভি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে রঙীন ছবির দৌলতে ও বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার দৌরাত্ম্যে সেই উদ্দেশ্য প্রায় নির্বাসিত। এখন প্রমোদ ও অবসর বিনোদনই টেলি-ভিশন দর্শকের বড়ো প্রত্যাশা। সংযোগ ও শিক্ষা এখন শত হস্ত দূরে।

সহরাঞ্চলেই টিভির প্রসার। কয়েক বছরের মধ্যেই টিভির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কলকাতা সহরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টিভি সেটের সংখ্যা ছিল ২৩৭, ৪৪৫টি। এখন আরো বেশি। সহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যেই টিভির জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি দিল্লীর National Institute of Health and Family Welfare এর Department of Communicationর মাধ্যম বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন রাজস্থানের চারটি জেলায়। এই সমীক্ষায় প্রকাশ যে, গ্রামাঞ্চলে টিভির জনপ্রিয়তা নেই এবং তার প্রভাবও খুব সীমাবদ্ধ।

আমরা পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের অনেকগুলি গ্রামে সমীক্ষা করে ঐ একই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একটি নমুনা সমীক্ষায় প্রকাশ—১৩৩০৪ টি টিভি সেটের মধ্যে ৭৫ ভাগই হচ্ছে হাই স্কুলে উত্তীর্ণ শিক্ষিতদের। এরা বিদ্যা অর্জন করেছে, বিত্তবান বলেই।

কিভাবে টিভির অনুষ্ঠান-সূচী তৈরী করা হয়, কারা করে, কাদের কথা মনে রেখে—এসব প্রশ্ন বিচার করলে এই সব কথাই বেরিয়ে আসবে যে, সহরের এলিট শ্রেণীই এর মধ্যমণি। তাদের কালচার, তাদের কথাই

প্রতিফলিত হয় এর মধ্যে। এমন কি লোকসংস্কৃতির যে নমুনা উপস্থিত করা হয়, তা হয় বিকৃত, না হয় মধ্যবিত্ত বাবুর দৃষ্টিভঙ্গীতে।

বর্তমান সমাজ কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক মাসমিডিয়ার চরিত্র হচ্ছে গণ-বিরোধী। ক্ষমতাবান শ্রেণী ও তার বশংবদ এলিট গোষ্ঠীর ধ্যানধারণা, ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ, রুচি ও আচার-আচরণে প্রচারের শক্তিশালী যন্ত্র। এ মাধ্যম একমুখী, কেন্দ্রীভূত। সুতরাং পারস্পরিক আদানপ্রদানের বা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্র অনুপস্থিত। সুতরাং এ হচ্ছে নীরবতার সংস্কৃতির উদ্গাতা। এ মাধ্যম অনুভূতিকে নির্বাসিত করে, জিজ্ঞাসার অন্ত ঘটায়, বোধশক্তি ও সৃজনীক্ষমতাকে খর্ব করে।

কমুনিকেশনের মূল অর্থ পারস্পরিক আন্তরিক সংযোগ—তা হয় নির্বাসিত।

এই পটভূমিতে ব্যাপক জনগণের স্বার্থে বিকল্প মাধ্যমের কথা আসে। বিকল্প মাধ্যম উৎসারিত হয় মেহনতি মানুষের সৃজনীক্ষমতা থেকে, তাদের নিজস্ব আঙ্গিক ও প্রকরণের উপর ভিত্তি করে।

এ মাধ্যম চেতনার উদ্বোধক এবং মুক্তিদায়ী প্রক্রিয়ার অঙ্গ। সত্যিকার আন্তরিক সংযোগ এর দ্বারাই সাধিত হতে পারে।

লোকায়ত সংস্কৃতির ধারার উপর ভিত্তি করেই এ মাধ্যম গড়ে উঠতে পারে।

কারণ, লোক মাধ্যম হচ্ছে গ্রামের অগণিত মানুষের নিজস্ব মাধ্যম, আবহমান কাল থেকে যা চিরপ্রবাহমান সজীব ও সচল। তাদের চেতনা, বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা মাধ্যম। স্বীয় পটভূমিকায় আপন প্রয়োজনে জনগণ থেকে উৎসারিত। এ কোন ধার করা মাধ্যম নয়, বা কোন আরোপিত উপায় নয়। এগুলি গ্রামের বা সহরের মেহনতি মানুষের দৈহিক, মানসিক দক্ষতা দিয়ে তৈরী, তাদের বুদ্ধিগত, ভাবগত উপলব্ধির মধ্যে বিকশিত, তাদের কল্পনার জগৎ ঘিরে এর বিস্তার। এ আধুনিক প্রয়োগ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও

বোল

সহজলভ্য হলে তাকে ব্যবহারে বাধা নেই। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এ-ও পরিবর্তনশীল।

লোকসংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয় সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকসংস্কৃতির রূপ ও বক্তব্য পরিবর্তিত হয়। সেদিক দিয়ে লোকসংস্কৃতি চিরায়ত হয়েও সমকালীন।

আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে লোক-মাধ্যমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একথা অনেকেই স্বীকার করেন।

তথাকথিত গণ-মাধ্যমগুলির প্রচণ্ড প্রতাপ ও গণ-বিরোধী ভূমিকায় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তাই অনেকেই মুখ ফিরিয়েছেন প্রচলিত লোক মাধ্যমের দিকে।

সংযোগ সাধন ও জনগণের সংগঠিত হবার ক্ষেত্রে প্রচলিত লোক-সংস্কৃতির ভূমিকা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বিগত দু বছর বিশ্বের চারটি দেশে সমীক্ষা কার্য চালানো হয়েছে। মেকসিকো, ফিলিপাইন, কেনিয়া ও ভারতবর্ষে এই সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।

এই সমীক্ষারই অঙ্গ হিসাবে আমরা পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি গ্রামে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়ে তথাকার লোক-সংস্কৃতির রূপ ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমান সংকলন সেই ক্ষেত্র গবেষণারই ফসল। ▭

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় লোকমাধ্যম

॥ এক ॥

টিভি, বেতার, সংবাদপত্র

জনগণের সামনে বক্তব্য প্রচারের জন্য কোন না কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রধানতঃ কয়েকটি মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন বক্তব্য প্রচারিত হয়ে থাকে। যেমনঃ ১. টিভি, ২. বেতার, ৩. সংবাদপত্র। এই তিনটি হলো শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। কিন্তু আমাদের গরীব দেশে শহর অঞ্চলে ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের বাড়িতে শুধু টিভি দেখা যায়। বর্তমানে নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে টিভি ক্রয় করার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। তবু বলা যেতে পারে, শহর অঞ্চলে গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে এবং বহু বস্তিতে টিভি ব্যাপক ভাবে ঢুকতে পারেনি। পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ অধিবাসী সুদূর গ্রাম অঞ্চলে বাস করেন। গ্রামে টিভি দেখার প্রশ্ন ওঠে না। কেন না, অসংখ্য গ্রামে আজও ইলেক্‌ট্রিক পৌঁছায়নি। এবার টিভি অনুষ্ঠানগুলির কথায় আসা যাক। টিভিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো অনুষ্ঠান দেখানো হয়। অধিকাংশ বিষয়ের আয়োজন করা হয় উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের ভালো লাগার মতো অনুষ্ঠান। মাঝে মাঝে শহরের ছেলে-মেয়েদের গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক পোশাক পরিয়ে কয়েকটি লোকনৃত্য পরিবেশন করতে দেখা গেছে। বিভিন্ন জেলা ও গ্রামের লোক উৎসব, লোকনৃত্য একেবারে যে দেখানো হয়নি তা নয়। কিন্তু তার সংখ্যা খুব অল্প। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন,

কলকাতা শহরে যাঁদের বাড়িতে টিভি আছে, তাঁদের অনেকে দরজায় খিল দিয়ে টিভি দেখেন। এর ফলে একই বাড়িতে একাধিক টিভির এণ্টেনা চোখে পড়ে। যেখানে এক সময় শহর ও গ্রামে দল বেঁধে নর-নারী কথকথা, পাঁচালী, মনসামঙ্গল গান শুনতো, বর্তমানে একসঙ্গে বসা লোপ পাচ্ছে। টিভি দরজায় খিল দিয়ে বসার দিকে নিয়ে চলেছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে বিচ্ছিন্নতার দিকে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মানসিকতার দিকে।

দ্বিতীয় মাধ্যম ঃ বেতার। বেতার একটি শক্তিশালী প্রচারের মাধ্যম। এই কথায় কোন বিতর্ক বোধ হয়ে উঠবে না। সুদূর গ্রামে ছোট ছোট ব্যাটারি চালিত বেতার অনেক চাষী, সাইকেলরিক্সা চালক, পানের দোকানেও দেখা যায়। বহু নর-নারী বেতার শোনে। বিশেষ করে কৃষিকথা, স্থানীয় সংবাদ ইত্যাদি অনেকের ভালো লাগে। সাঁওতালী অনুষ্ঠান সাঁওতাল সমাজে অনেকের কাছে প্রিয় হয়েছে। অনেক গ্রামে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বেতারে গ্রামীণ অনুষ্ঠান শুনতে দেখা যায়। বেতারেও অধিকাংশ লোকসংগীত শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়ে গেয়ে থাকেন। গ্রাম-বাংলার অনুষ্ঠানগুলিতে গ্রামের শিল্পীদের গানও শোনা যায়। কিন্তু খুব বেশি নয়। গ্রামের কথায় আলোচনা কিংবা লোকসংগীত নিয়ে কিছু বলার সময় গ্রামের লোক-শিল্পীদের বাদ দিয়ে বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। টিভি এবং বেতার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারের যন্ত্র। প্রচারের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের ছকে ফেলা বক্তব্য প্রচার করা হয়।

তৃতীয় শক্তিশালী মাধ্যম ঃ সংবাদপত্র। এখানে আমি নিজের কোন বক্তব্য রাখছি না। বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামের সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট দোকানদার লোকশিল্পীর সঙ্গে কথা বলার সময় যে সব মন্তব্য শুনেছিলাম, তাঁদের সেইসব বক্তব্য এখানে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তুলে ধরা হলো।

অনেকের ধারণা, সংবাদপত্রগুলি বর্তমানে শহর অঞ্চলের ধনী,

মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে বেশি যায়। দৈনিক সংবাদপত্র শহর অঞ্চলে বিক্রি বেশি, সংবাদও থাকে শহরের।

জনৈক প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছিলেন, এক সময় বড় কাগজগুলি গ্রামের কথা বেশি লিখতো। এই কারণে গ্রামে গ্রামে সেদিন স্বাধীনতার সৈনিক প্রচুর দেখা গিয়েছিল। তাঁদের সেদিনের ভূমিকা ভুলে যাবার নয়।

গ্রামের অনেকে উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ সুদূর গ্রামে ঘরে ঘরে আজও সংবাদপত্র ঢুকতে পারেনি।

প্রথম কারণ. গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বর্তমানে ৭০।৮০।৯০ পয়সা দিয়ে কাগজ ক্রয় করার ক্ষমতা অনেকের নেই।

বাঁকুড়া জেলায় জনৈক প্রবীণ শিক্ষক বলেছিলেন. এক সময় বাংলা অর্দ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ গ্রামে আসতো। গ্রামের মানুষ কম খরচে প্রায় দৈনিক কাগজের সংবাদ পাঠ করতো। সেই ধরণের অর্দ্ধ সাপ্তাহিক আর দেখা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ, নিরক্ষরতা।

তৃতীয় কারণ, যে সব সংবাদ বেতারে শোনা যায়, অধিকাংশ সেইসব সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কয়েকজনের ধারণা, বেতারে যা শুনেছি, আবার সেই সংবাদ জানার জন্য পয়সা খরচ করবো কেন? যদিও এই কথা কয়েকজনের মুখে শুনেছিলাম।

চতুর্থ কারণ. সংবাদপত্রে গ্রামের কথা জেলার কথা স্থান পায় অতি সামান্য। কাগজে সংবাদ থাকে অল্প, বিজ্ঞাপন বেশি চোখে পড়ে।

পঞ্চম কারণ, অধিকাংশ গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষের সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস নেই।

ষষ্ঠ কারণ, গ্রামে যাদের টাকা-পয়সা আছে. তাদেরও কাগজ ক্রয় করে পড়ার অভ্যাস অনেকের হয়নি।

সপ্তম কারণ, সংবাদপত্র যে একটি প্রচারের শক্তিশালী বাহন, সুদূর গ্রামের বহু গ্রামবাসী এই কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়না।

এখন প্রশ্ন আধুনিক প্রচারের মাধ্যমের দিকে না তাকিয়ে কি ভাবে গ্রামের অসংখ্য নর-নারীর সামনে বক্তব্য তুলে ধরা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, সেকালের গ্রামীণ গণমাধ্যমগুলি নিয়ে আলোচনা করলে।

॥ দুই ॥

হাট, মেলা, গ্রামীণ লোকনাট্য, যাত্রা, পথের নাটক, আলকাপ, লেটো, মাছানি

গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। সাধারণ মানুষ নিপীড়িত জনের হয়ে প্রতিবাদ করেছে। যেখানে অন্যায় দেখেছে, সমাজবিরোধী কাজ চোখে পড়েছে, সেইসব কথা দলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা আমরা দেখেছি। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন ধরণে বা রীতিতে প্রচার করতেন। তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরাতেন নানা ভাবে। জনগণের কাছে প্রচারের ভালো জায়গা, ১. হাট, ২. মেলা, ৩. গ্রামীণ লোকনাট্যের আসর।

সমাজে অনাচারের কথা জনসমাগম বহুল হাটের মাঝে প্রকাশ করার রেওয়াজ এক সময় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা' লেখার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো: '........একটা খাসী বলিদান দিয়া তাহারই নাড়ীভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে পোরা হইত। খানা-পিনা শেষ হইলে, অভিযোক্তা তাঁহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন। তাহা শুনিয়া ঘোঁট হইত। প্রায়শঃ লাম্পট্যের অভিযোগই করা হইত।.......তাহার পর এই নাড়ীভুঁড়িপূর্ণ হাঁড়ি মাথায় করিয়া হাটের দিনে একটা কেন্দ্রস্থ বড় হাটে উপস্থিত করিতে হইত। হাট যখন জমজমা চলিতেছে, তখন হাটের মধ্যস্থলে কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া আছাড় মারিয়া হাঁড়ি ভাঙ্গা হইত।'

সেকালে হাটে ওই ভাবে দশের সামনে সমাজবিরোধী কাজের প্রতিবাদ করা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকতো কেচ্ছা-কাহিনী। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার, বর্ধমান জেলায় যে হাটে হাঁড়ি ভাঙা হতো তার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯৪৫ সালের একটি গানে।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে গানটি সংগ্রহ করেছিলাম। ওই সময় কোন এক অসৎ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে সঙের মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল ঃ হাটে হাঁড়ি ভাঙবে লোকে, / পড়বি ধরা সবার চোখে। / চোরা-চালানী বলবে সবে, / লাভের খেলা তখন হবে।

ওই রকম আরও কয়েকটি গান ও ছড়া 'হাটে হাঁড়ি ভাঙার' কথা শুনেছিলাম। যেমন ঃ

ভাঙ ভাঙ ভাই, আজ হাটে হাঁড়ি,
চোরা ফোঁটা কেটে, দেখ চড়ে গাড়ি।
চোরা ক্ষুধার অন্ন, লুকিয়ে রাখে,
চাল, চিনি, ময়দা, বস্তায় ঢাকে।

এই গান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল।

একসময় গ্রামীণ মেলায় বহু নর-নারীর ভিড় হতো। আজও ভিড় হয়ে থাকে। গ্রামীণ মেলার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ শিল্প। হারিয়ে যাচ্ছে লোকসংগীত, লোকনাট্য। কিন্তু ভিড় আজও চোখে পড়ে। এই ভিড় দেখে এক সময় লোকনাট্যের দল মেলায় দাঁড়িয়ে গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতেন।

সেকালে গ্রামীণ যাত্রাগানে সমাজে ন্যায় আদর্শ, সততা ইত্যাদি প্রচার করা হতো। গ্রামীণ যাত্রাগানের ভেতর দিয়ে 'ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়' এই কথা সেকালের পালাকারেরা তুলে ধরতেন। যাত্রাগানের 'বিবেক' মাঝে মাঝে আসরে ছুটে এসে গান গেয়ে ন্যায় ও সত্যের বাণী প্রচার করতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলকাতায় যাত্রাদলের লোকেরাও নীরব

ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক প্রচারের জন্য কয়েকটি যাত্রাদল চেষ্টা করেছিল। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী স্বদেশী আন্দোলনে রাজবন্দী ও অনশন আন্দোলন নিয়ে একখানি যাত্রার পালা রচনা করেছিলেন। সেকালের জনপ্রিয় যাত্রার পালাকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'রণজিৎ রাজার জীবন যজ্ঞ' পালা লিখেছিলেন। মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রাগান গেয়েছিলেন। বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রচারে যাত্রাগানকে ব্যবহার করেছিলেন।

মুকুন্দদাসের পূর্ব নাম যজ্ঞেশ্বর দে। বরিশালের (বর্তমানে বাংলাদেশ) বৃদ্ধরা আদর করে 'যজ্ঞা' বলতেন। পিতার নাম—গুরুদয়াল দে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরা গ্রামে মুকুন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন।

তৎকালীন ইংরেজ সরকার শঙ্কিত হয়ে গানের ভেতর থেকে রাজদ্রোহকর উক্তি আবিষ্কার করে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। শুধু তাই নয়, যাত্রাগান চলার সময় তিনি কয়েক জায়গা থেকে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। অনেক জায়গায় তাঁর যাতায়াত করাও নিষিদ্ধ হয়। মুকুন্দদাসের কণ্ঠে একটি গান খুব বিখ্যাত হয়েছিল। সেই গানটি রচনা করেছিলেন, কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গানটি হলো এই ঃ

সাবধান। সাবধান !!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান ॥
ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছ্বলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।

—ইত্যাদি

মুকুন্দদাসের যাত্রাদল বিহারের নানা স্থানে অভিনয় করে জনসাধারণের সামনে পল্লীসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, দেশপ্রীতি ইত্যাদি কথা প্রচার করেছিলেন। ১৯২৬ সালে রাঁচি, জামসেদপুর প্রভৃতি বিহারের

কয়েকটি শহরে মুকুন্দদাসের দল চিত্তাকর্ষক অভিনয়ের জন্য অনেকগুলি রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। মুকুন্দদাসের যাত্রার পালা ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দী তর্জমার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুকুন্দদাসকে দিয়ে বিহারের জনসাধারণের সামনে পালাগুলি দেখিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা। তখন স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে দেশের সাধারণ মানুষ। সেই সময়ের কথা। ওই সময় যশোহরে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মুকুন্দ-দাসের বিভিন্ন যাত্রার পালা কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়েছিল। অসংখ্য শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে মুকুন্দদাসের যাত্রাগান শুনেছিলেন। ওই সময় মাতৃপূজা' নামে পালাটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। মুকুন্দদাস ওই পালা অভিনয় করতে চান নি। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ পালা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে স্থানীয় থানা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

থানা অফিসার সকলের বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহের জন্য নিজে সরকারী ঝঞ্ঝাটের দায়িত্ব নিয়ে থানা প্রাঙ্গণের ভেতর 'মাতৃপূজা' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বদেশী যাত্রার ইতিহাসে ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বললে বোধহয় ভুল হবে না। 'মাতৃপূজা' যাত্রাগানে তৎকালীন সরকার শঙ্কিত হয়ে পালার কয়েকটি গানের মধ্যে রাজদ্রোহকর লাইন আবিষ্কার করে মুকুন্দদাসকে আড়াই বছরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করেছিল। কারাগারে তাঁকে ঘানি টানতে হতো। জনগণের সামনে স্বাধীনতার বাণী, ইংরেজবিরোধী বক্তব্য প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সেকালে স্বদেশী যাত্রাগান যথেষ্ট কাজ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সর্বত্র শোনা যেত স্বদেশী গান। সভা, শোভাযাত্রা, বয়কটের কথা, পিকেটিং-এর প্রতিজ্ঞার কথা। ওই সময় স্বদেশী প্রচারের জন্য সহায়তা করেছিলেন সেকালে বিভিন্ন স্বদেশী যাত্রাদলের কর্মকর্তারা।

এক সময় পথের নাটকের মধ্য দিয়ে জমিদারের অত্যাচার দুর্নীতি-পরায়ণ এক শ্রেণী কদাচার সরকারী আমলাদের দৌরাত্ম্যের কথা বলা

হতো। মালদহে বিভিন্ন গম্ভীরা দল পথে অভিনয় করে, গান গেয়ে স্বদেশী আন্দোলনের কথা বলেছিল।

আলকাপ মুর্শিদাবাদ জেলার লোকনাট্য। অনাড়ম্বর ভাষায় সরলভাবে গ্রামজীবনের কথা আলকাপে প্রকাশ করা হয়। এক সময় সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে আলকাপের দল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। আলকাপের একটি বিখ্যাত গানের কিছু অংশ হলো এই—

আমরা ভাই ভাই হিন্দু মুসলমান,
এক মাটিতে বাস করি,
এক সুরে গায় গান,
আমরা হিন্দু মুসলমান।

বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় অনেক গ্রামে লেটোর দল আছে। লেটোর দল সাধারণতঃ বিভিন্ন মেলায় অভিনয় ও গান গেয়ে থাকে। নেশাখোরের বিরুদ্ধে লেটোর দল ব্যঙ্গ করে ছড়া কাটে, যেমন—

চুক চুক চুক চুক চোখ বুজে খায়,
টলমল টলমল চলে দুটি পায়।
কাঁদরেতে পড়ে যায় সব কিছু ভুলে,
পথ ভুলে কেহ যায় দামোদর কূলে।

শোনা যায়, বর্ধমানের লেটোর দল কয়লা শ্রমিকদের আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের শোষণের কথা নিয়ে পালা রচনা করেছিল। ওই সময় লেটোর দল গান ও অভিনয়ে কয়লা শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। আলকাপ, লেটো ইত্যাদি আজও গ্রামবাংলায় প্রচারের মূল্যবান মাধ্যম।

এক সময় পুরুলিয়ায় বিভিন্ন গ্রামে একটি লোকনাট্য দেখা যেত। ওই লোকনাট্যের নাম 'মাছানি'। মাছা=যারা মাছ ধরে। মাছার বউ=মাছানি। পাড়া থানায় একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারা,

স্বভাব ইত্যাদি সাদৃশ্য থাকলে বলা হতো=জড়িমাছা। এই অঞ্চলে নকল করা, ব্যঙ্গ করা=মাছানি বলা হয়। মাছানি=মাছুয়া অর্থাৎ জেলের বউকে নিয়ে এই নাটক। গ্রামের এক জেলের বউ এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে গ্রামের পথে 'মাছ চাই গো' বলে ডাক দিয়ে চলেছিল। পথে চার বেকার বাউণ্ডুলে নাচতে নাচতে এসে প্রেম নিবেদন করে। মাছানিকে বিয়ে করতে চায়। এই হলো নাটকের বিষয়। হয়তো প্রথম নাটক মাছানিকে নিয়ে কোন গ্রামীণ নাট্যকার মাছানি রচনা করেছিলেন। অধিকাংশ লোকসংগীতের কবির নাম জানা যায়না। ঠিক তেমনি প্রথম মাছানি পালার কে নাট্যকার তা অজ্ঞাত। এই নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। কোন প্রশ্ন ওঠে না। লোকনাট্যের নাট্য-কারেরা এই নিয়ে চিন্তা করেন না। বর্তমানে এই অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন সমস্যা গ্রামবাসীর সামনে নাচে-গানে-লোকনাট্যে বক্তব্য তুলে ধরা হলে 'মাছানি' বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত কাহিনী রেখে বিভিন্ন নামে পালা অভিনীত হয়। মাছানি অতি দ্রুতগতিতে অভিনীত হয়ে থাকে। নাটকের প্রতি পালা নাচে ও গানে ভরা। অভিনেতাদের পোযাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। ছেলেরা মেয়ে সাজে। গ্রামের একেবারে তলার মানুষের জীবনযাত্রার সেই আটপৌরে পোশাক লোকনাট্যে প্রকাশ পায়। গ্রামবাংলার সর্বহারা, নিঃস্ব, ভূমিহীন দরিদ্র, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি জনজীবনের আলেখ্য তুলে ধরা হয় প্রতি পালায়। অধিকাংশ পালা সমসাময়িক জীবনযাত্রা নিয়ে কৌতুক নাটিকারূপে ব্যঙ্গরসে পরিবেশন করা হয়।

॥ তিন ॥

ঢুলি, গড়াত

এক সময় সংবাদ দশের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার কাজ ঢুলিরা করতো। অনেক জমিদার জমি দিয়ে গ্রামে ঢুলি বসিয়েছিল। তারা জমিদারের বক্তব্য ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতো। অনেক জায়গায় ঢুলিরা টাকা-

পয়সা উপায়ের পথ হিসাবে অন্য লোকের জন্য ঢোল বাজিয়ে প্রচার করে বেড়াতো। প্রায় ৩৫ বছর আগে বাঁকুড়া শহরে এক ঢুলিকে দেখেছিলাম। সে ঢোল বাজিয়ে পুলিশ, আদালত ইত্যাদি সরকারী আদেশ প্রচার করতো। যখন কোন সরকারী হুকুম প্রচার করার মতো থাকতো না, তখন সে বাঁকুড়ার ব্যবসায়ীদের প্রচারের জন্য ঢোল বাজাতো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রচার করতো। যেমন, কোন সিনেমায় কি বই এসেছে। সেই বইতে কোন কোন অভিনেতা, অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন, তার কথা হেসে প্রায় অভিনয় করে বলে যেত। মনে হতো, পথের নাটক দেখছি।

কলকাতায় প্রায় চল্লিশ বছর আগে পুলিশ বিভাগ থেকে দোলের সময় ঢুলি দিয়ে প্রচার করা হতো। যাতে কেহ রং অপরিচিত ব্যক্তির গায় না দেয়। যদি কোন অভিযোগ থানায় যায় তা' হলে যে রং দেবে, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। ইত্যাদি বলে ঢুলি ঢোল বাজিয়ে প্রচার করতো।

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে রামকৃষ্ণপুর (নতুনডি) গ্রাম। থানা ঃ পাড়া। 'সেণ্টার ফর কম্যুনিকেসান এ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাকসন'-এর অধ্যক্ষ সঞ্জীব সরকারের সঙ্গে ওই গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের সমীক্ষা করার সময় একটি অজানা সংবাদ আমরা জানতে পারি। সেই সংবাদটি হলো এই ঃ

রামকৃষ্ণপুর (নতুনডি) গ্রামের বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'গড়াত' নামে পরিচিত। ওই গ্রামের যিনি 'গড়াত', তিনি বাউরি সম্প্রদায়ের লোক। গ্রামে মাহাতোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ধুনিয়া জেলে বাউরি এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ওই গ্রামে বাস করেন। গড়াত গ্রাম-ঠাকুরের পূজোর কথা, গ্রামের সকলকে জড়ো হবার সংবাদ প্রচার করেন। গ্রামে জড়ো হওয়াকে 'মজলিশ' বলা হয়। গ্রামবাসীরা সকলকে সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব গড়াতকে দিয়েছেন। গড়াত যদিও গ্রামীণ অনুষ্ঠান ও উৎসবের কথা প্রচার করেন তবু আমাদের আলোচনায় গড়াতের কথা উল্লেখ করা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

॥ চার ॥

ভাট, পটুয়া, হেটোকবি

ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম (বর্তমানে বাংলাদেশ) কাছাড় ও ত্রিপুরাতে পল্লীকবিদের 'ভাট' বলা হতো। তাঁদের গান ভাট গান বা ভাটের গান নামে পরিচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেকালে মোহান্তরা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ভাট রাখতেন। ভাটেরা মঠে থাকতেন। মোহান্তরা তাঁদের আহার, বাসস্থান এমন-কি সংসারের খরচ চালাবার মতো অর্থ দিতেন। ভাটেরা গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায়, এমন-কি বাংলার বাহিরে গিয়ে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। তারকেশ্বর শিবমন্দিরেও ভাটেরা থাকতেন। প্রায় শতবর্ষ আগে এলোকেশীর মামলা একটি ঘৃণিত ঘটনা। মোহান্তের ঘৃণ্য কাজের কথা প্রথমে ভাটেরা ছড়া ও গান রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন ভাটেদের পাশে কালীঘাটের পটুয়ারা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা সেদিন মোহান্তের জঘন্য-কদর্য ঘটনা নিয়ে পট এঁকে প্রচারে নেমেছিলেন। মোহান্তকে কারাগারে গিয়ে ঘানি টানতে হয়েছিল। সেদিনের বিখ্যাত গান ঃ

> মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
> এ তেল এক ফোঁটা দিলে,
> টাক ধরে না চুলে,
> কানায় চোখে দেখতে পায়।

তা' ছাড়া বাংলা ১৩৩১ সালেও তারকেশ্বরের আর এক মোহান্ত দ্বারা অনেক অত্যাচার শুরু হয়। তার প্রতিবাদে হেটো কবিরা নেমেছিলেন। কবিরা পথে-ঘাটে-মেলায় চটি বই বিক্রি করতেন। সেকালে অধিকাংশ ওইসব বই এক পয়সা দু পয়সা দামে বিক্রি হতো।

যেখানে কদর্যতা কবিদের চোখের সামনে ধরা পড়তো সেখানেই তাঁরা প্রতিবাদ করতেন। একদিকে তাঁরা সত্যনিষ্ঠ মানুষের জয়গান

করতেন, অপরদিকে স্বার্থান্ধ, লোভী ও ক্ষমতাপরায়ণ মানুষের চক্রান্তের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। ওইসব কবিদের প্রচারের ফলে আন্দোলন বিরাট আকার নিয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এসেছিলেন। সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখনী ধরেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম কবিতা লেখেন ঃ

জাগো, আজ বঙ্গবাসী / মজাল পাপ-চণ্ডাল তোদের বাঙ্গালা / দেশের কাশী ! / ....পূজার কমণ্ডলুর / গঙ্গাজলে মদের ফেনা উঠ্ছে ভাসি / জাগো বঙ্গবাসী !

মোহান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার হেটো কবিরা করেছিলেন। দেশপ্রেমিকদের রক্তে তীর্থক্ষেত্রের মাটি রাঙা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন সফল হয়েছিল। হেটো কবিদের ব্যাপক প্রচারের ফলে মোহান্তের সশস্ত্র গুণ্ডারা বন্দুক-বুলেট নিয়ে পালিয়েছিল। সেদিনের একটি হেটো ছড়া হলো এই ঃ

মোহান্তের এ নবাবী কার ধন পেয়ে ?
কিবা তার অধিকার ?
কেন ক'রে অনাচার ?
কেউ ফিরে একবার
দেখ বিনে চেয়ে ?
... .
সাধে বকি, দেখ দেখি দান পত্র খুলে,
ধারা কি তার এম্নি ধারা,
মোহান্ত হইবে যারা,
লুচি মণ্ডা ব্রাণ্ডি মারা,
হবে চুল খুলে ?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, হেটো কবিরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু ছড়ার বই ছাপিয়েছিলেন। তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ দশের সামনে প্রচার করার চেষ্টা করেন। মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে

অনেকগুলি হেটো বই ছাপা হয়েছিল। যেমন ঃ ১৯২১ সালে হরিচরণ প্রামাণিক লিখেছিলেন, 'এবার পূজায় গান্ধী রাজা'। বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতার জয়গান জনৈক হেটো কবি গেয়েছেন। তিনি কলকাতার প্রশস্তি করতে গিয়ে বলেছেন, এই শহরে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার কোন ঠাঁই নেই। কলকাতা শহরে মানবতার জয়গান শোনা যায়। হয়তো হেটো কবির কথা অনেকের মনে দাগ কাটবে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা। এই কারণে সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

সারা ভারত কলকাতায়, এমন আর কোথায় আছে।
ভারতবাসীর কলকাতা, ধন্য শহর ভুবন মাঝে॥
বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মাদ্রাজ, আসাম, মিজোরাম।
কাশ্মীর, গুজরাট, পাঞ্জাব, সবার জন্য মরে ক্ষুদিরাম॥
ভারতের জন্য দেয় প্রাণ, কত হাজার শহীদ হলো।
কলকাতা উদারতা ভরা, ভারতবাসীর প্রিয় বলো॥
গোপবন্ধু উৎকলমণি, তিলকের মূর্তি হেথা আছে।
দারভাঙ্গারাজ আরো কত, মূর্তি আছে কলকাতা মাঝে॥
নেই বিচ্ছিন্নতাবাদ হেথা, নেই সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন।
প্রাদেশিকতা প্রশ্ন ওঠে না, মানবতার কথা ভিন্ন॥
কলকাতার পাশে বয়ে যায়, পবিত্র গঙ্গা মন্দাকিনী।
বাজে মিলনের সুরবাহার, বাজে ভালোবাসার রাগিনী॥

॥ পাঁচ ॥

সঙ

সঙ হাসির গান গেয়ে যেমন সকলকে প্রচুর আনন্দ দিত, ঠিক তেমনি সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির ওপর কশাঘাত করে দায়িত্বশীল

মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাত। সমাজ চেতনামূলক গান ও ছড়াগুলি এদিক দিয়ে নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান উপাদান বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

সঙ, হেটো কবিতা, ভাটের গান, ঢুলি, লেটো, পথের নাটক, পটুয়ার গান প্রভৃতি দ্বারা আজও সাধারণ মানুষ বক্তব্য দশের সামনে তুলে ধরতে পারে। ওই সব মাধ্যমের শক্তি নেহাত কম নয়। ওই সব মাধ্যমের সাহায্যে ব্যাপক প্রচার করা সম্ভব। কেননা, গ্রামে গ্রামে আজও নিরক্ষর মানুষের বাস প্রচুর। যারা সামান্য লেখাপড়া জানে, তারা অনেকে সংবাদপত্র পড়ে না। তাদের সামনে ওই সব মাধ্যমে প্রচার করলে অনেকের মনে গভীর ভাবে দাগ কাটতে পারে। □

সুনীল মাহাতো

পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি তথা সংযোগ মাধ্যম

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচণ্ড অগ্রগতির ফলে বিরাট পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে বা বর্তমান প্রজন্মের মানুষের করায়ত্ত হয়েছে। বর্তমান সময়টাকে পৃথিবী ছাড়িয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টার সময় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অন্যদিকে মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে বা আন্তরিক যোগাযোগ ক্রমশঃই কমে আসছে একথা ভেবে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ চিন্তিত।

মানুষে মানুষে এই বিচ্ছিন্ন মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে যে-সমস্ত কারণগুলি আছে তার মধ্যে আমরা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্যহেতু একশ্রেণীর মানুষ শিক্ষা, শিল্পচর্চা, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়সমূহে প্রভুত জ্ঞান অর্জন করে মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বেশী সংখ্যক মানুষ প্রচলিত গতানুগতিক ধ্যান ধারণা ইত্যাদিকে সম্বল করে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার সুফল তারা ভোগ করতে পারছে না। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ এবং গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যেন দুই মেরুর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে।

আমরা যতই সভ্যতার বড়াই করি না কেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক বা যান্ত্রিকতায় অভ্যস্তদের কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ যতখানি বিস্ময়ের বস্তু অন্যদিকে গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষের কাছে শহুরে যান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত মানুষ ঠিক ততখানিই বিস্ময়ের বস্তু।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন প্রযুক্তিবিদ্যা তথা যান্ত্রিকতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জীবনে জটিলতাও বৃদ্ধি পাবে এটা বিজ্ঞানসম্মত। যান্ত্রিকতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশদূষণ, বৈষম্য, খাদ্যাভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদির সমস্যাগুলি তীব্রতর আকার ধারণ করবে এবং এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর সীমিত ভাণ্ডার নিঃশোষিত হবে এবং তখন মানুষের আর ফেরার পথ থাকবে না। অবশ্যই অন্য মতে মানুষ এরও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে এবং সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। যাই হোক বর্তমান সময়ে উদ্ভূত সংযোগ সমস্যাটিকে আমরা যান্ত্রিকতা-প্রসূত বলেও মেনে নিতে পারি।

শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ভাববিনিময়ের যে সমস্ত মাধ্যম আধুনিককালে ব্যবহৃত হচ্ছে কথা-সাহিত্য সঙ্গীত সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি গ্রাম্য মানুষের ক্ষেত্রে দুর্লভ তথা অবোধ্যই থেকে যাচ্ছে। এক দিকে নাগরিক শিক্ষিতরা পৃথিবীর আধুনিকতম বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন অন্য দিকে গ্রাম্য গণমানুষ সেই আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে কালযাপন করছেন, সুতরাং বিচ্ছিন্নতা বাড়াই স্বাভাবিক।

পুরুলিয়া ঃ

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পুরুলিয়া স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে মানভুম জেলার অন্তর্ভুক্ত থেকে বিহারের অংশ ছিল। পরে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে বিহারের ঝরিয়া, ধানবাদ, জামশেদপুর ইত্যাদি খনি ও শিল্পাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত বলে এই জেলা এযাবৎ অবহেলিতই রয়েছে। শিল্পায়ন ঘটেনি, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থারও উন্নতি হয়নি। এই হিসেবে অর্থ-নৈতিক দিক থেকে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা পিছিয়ে রয়েছে অনেকখানি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার শিল্পায়ন, শিক্ষা তথা সংযোগমাধ্যম, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির

ভালোমন্দ থেকে পুরুলিয়ার জনসংখ্যার শতকরা আশি নব্বই ভাগই অনেক দূরে। এদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিই একমাত্র সংযোগমাধ্যম।

যদিও আমরা লোকমাধ্যমের আলোচনাকালে একে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি বলে উল্লেখ করছি তবুও মনে রাখতেই হবে কোন একটি জেলার ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে কোন সংস্কৃতিকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এর বিস্তৃত অনুযায়ী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একে অনেকেই মানভূম সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হলেও পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

পুরুলিয়ার গণমানুষ ঃ

জনসংযোগের ক্ষেত্রে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সংস্কৃতির ধারক বাহক বা স্রষ্টা যারা তারা হলেন পুরুলিয়ার আদিম অধিবাসী সাঁওতাল মাহাত, ভূমিজ, মাছলি মাল, খেড়িয়া, ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসী অনার্যগোষ্ঠী, রাজোয়াড়, বাউরী, হাড়ি, ডোম, কামার, কুমহার, কুইরী, তাঁতি, জোলা ইত্যাদি হরিজন তথা বৃত্তিজীবিগোষ্ঠী যারা অনার্য বংশসম্ভূত।

সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত (কুড়মি) ওঁরাও, খেড়িয়া ইত্যাদি আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতালদের সাঁওতালি, ভূমিজদের মুণ্ডারী কুড়মিদের কুড়মালি, ওঁরাওদের ওঁরাও খেড়িয়াদের খেড়িয়া ইত্যাদি ভাষাগত বা বিভিন্ন আচারগত বিভিন্নতা আছে। বাঙালিগোষ্ঠীগুলি বাংলা, হরিজন ও বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীগুলি বাংলা ঝাড়খণ্ডী বাংলা, কুড়মালি ইত্যাতি ভাষায় কথা বলেন। যদিও অনেকের মতে হরিজন ও বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীগুলিরও নিজস্ব গোষ্ঠীভাষা ছিল যা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে।

সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় পুরুলিয়ার এই আদিবাসী, হরিজন ও বৃত্তিজীবী জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভাষা বৃত্তি

আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম, জীবনযাপন, সামাজিকতা, ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাও গড়ে উঠেছে. তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়া যেগুলি ভারতবর্ষে বহুদিন থেকে চালু আছে তাতে উক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির বিভিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতিই একমাত্র সংযোগমাধ্যম যা এদেরকে এই বিচ্ছিন্নতা থেকে সযত্নে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং একাত্ম হবার সুযোগ করে দিচ্ছে।

লোকসংস্কৃতি এবং জনসংযোগ ঃ

শিষ্ট সাহিত্য, ধ্রুপদী নৃত্য, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নাট্যকলা, শিল্পকলা ইত্যাদি থেকে রসাস্বাদন করতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষা বা যে ধরণের মানসিকতার প্রয়োজন, পুরুলিয়ার গণমানুষ তা থেকে অনেক দূরে। সুতরাং আধুনিক গণমাধ্যম, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা রেডিও, টেলিভিশন, আধুনিক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিন্দী সিনেমার গান ইত্যাদির প্রতি তাদের অজানাজনিত প্রচণ্ড কৌতূহল থাকলেও তারা এগুলি থেকে রসাস্বাদন করতে পারে না বা এগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। এগুলির ভাষা, ভাব, চিন্তন, আঙ্গিক, বিষয় তাদের অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের আগে প্রতিটি আদিম গণসমাজেরই একমাত্র সংযোগমাধ্যম ছিল তাদের লোকসংস্কৃতি। পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি অদ্যাপি সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছে। পুরুলিয়ার লৌকিক পালাপার্বনগুলি, যথা, আখানজাতরা বেঝাবিঁধা, সিঝানঅ, চৈতুপরব, ভগতাপরব, সারহুল, শিকারপরব, রহিন-করম, উতি, চুর্দ, ছাতা ভাদু, জিতিআ, জিলহুর, সহরই, বাঁদনা, ডিনি, টুসু ইত্যাদিতে প্রচণ্ড জনসমাগম ঘটে এবং পারস্পরিক ভাববিনিময় সংঘটিত হয়।

এই পালাপর্বণ তথা আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এখানকার ছো, নাটুআ, করম, ভঁইড়, কাঠি, নাচনি, ঝুমুর, টুসু, ভাদু, জাওআ, সহরই,

বিহা, ঝাঁতি ইত্যাদি লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত বা লোকসাহিত্যের সৃজন এবং বৃদ্ধি ঘটেছে। যেগুলি বর্তমানে পুরুলিয়ার জনসংযোগের অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত।

পুরুলিয়াতে গরাম পূজা থেকে শুরু করে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানে গ্রামীণ জনসাধারণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এই জনসমাগমগুলি কখনও গ্রামীণ কখনও আঞ্চলিক কখনও বা জেলাভিত্তিক হয়ে ওঠে। টুসু, চৈত পরব, ইঁদ, ছাতা ইত্যাদি মেলাগুলি আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক সময় জেলাভিত্তিক বা তারও বেশী ব্যাপ্তি ঘটায় এবং জনসমুদ্রে পরিণত হয়। মেলাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উল্লেখযোগ্য কোন আকর্ষণ ছাড়াই এই মেলাগুলি জমে উঠছে। বাইরে থেকে দেখলে এই বিশাল জনসমাগমকে অহেতুক মনে হবে, কিন্তু আন্তরিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে জনসংযোগই এই মেলাগুলির প্রধান আকর্ষণ। দূর-দূরান্তের মানুষের সঙ্গে পরিচয়, ভাব-বিনিময়, আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদিই এই মেলাগুলির প্রধান বিষয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে চাকোলতোড়ের ছাতা মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ সম্মিলিত হয়। ছাতাটাঁইড়ে নাচগান করে রাত্রিযাপন করে এবং বহু ছেলেমেয়ে এই মেলা থেকেই তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেয়।

করম নাচ ও গীত ঃ

ঝুমুর পুরুলিয়ার লোকনৃত্য, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। করমনাচ ও করমগীতকে অনেকেই ঝুমুরের সৃজনভূমি বলে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং করম সম্বন্ধে আলোচনা না করলে পুরুলিয়া তথা ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি তথা লোকমাধ্যম সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশী তিথিতে এই ব্রত হয়। এতে কুমারী বা নিঃসন্তান মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। জাওআ ডালিতে শস্যবীজ পুঁতে তা থেকে অঙ্কুরিত শস্যকে ঘিরে মেয়েরা হাত ধরাধরি করে দু পা এগিয়ে

এক পা পিছিয়ে কখনো নুয়ে নুয়ে গীত সহকারে নৃত্য করে। করম ব্রত নিয়ে করমু ধরমুর উপাখ্যান ইত্যাদি লিখিত হলেও করম যে মূলতঃ শস্যোৎপাদন তথা সন্তানকামনার ব্রত এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত।

বিয়ে হওয়ার পর করমের সময় প্রথম বছর মেয়ে অবশ্যই শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আসবে। এবং শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ের বাপের বাড়ীতে করম ব্রতের জন্য শাড়ী ও অন্যান্য পূজার সরঞ্জাম অবশ্যই পৌঁছে দিতে হবে। এটা এখানকার নিয়ম। একে 'করম কাপড়' বা 'করম ডালা' বলা হয়। এ সম্বন্ধে মেয়েদের গীত আছে, যেমন—

"অ তর আব্বু নেহি আইল করম ডালা
লো রাজবালা।"

যদিও প্রথম বছরের বিবাহিত মেয়েরা নিয়মমাফিক বাপের বাড়ী আসে তবু করমের সময় সাধারণভাবে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে আসে।

দূর-দূরান্তের শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়েরা তাদের সদ্য বিবাহের অভিজ্ঞতা শ্বশুর বাড়ীর মানুষজন সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে বাপের বাড়ীতে মিলিত হয় এবং তাদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয়। শ্বশুর বাড়ীর তিক্ত অভিজ্ঞতাও করমগীতের মাধ্যমে তারা পরিস্ফুট করে। যেমন—

১। একদিনকার হলইদ বাঁটা
তিনদিনকার বাসি লো
মা বাপকে বল্যে দিবি বড় সুখে আছিলো।

২। সাসেকা দেসে ঢাকল ঢাকল পাতগ
সাসে বাঁটই ছুটি ছুটি ভাগ গ।
একা মনে কর‌ইএ বিনি বিছি খাব গ
দসর মনে কর‌ইএ নেইহর রুসি জাব লো।

অর্থাৎ এখানে মেয়েটি শ্বশুর বাড়ীতে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ। প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও সে বলছে বাপ মাকে বলে দিও আমি এই রকম সুখে

দিন কাটাচ্ছি। ২য় গীতে শ্বশুর বাড়ীর প্রাচুর্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে তবু সেখানে তাকে পেট পুরে খেতে দেওয়া হচ্ছে না। কখনও ভাবছে কোনক্রমে কাটিয়ে দেবে, কখনও ভাবছে বাপের বাড়ী পালিয়ে যাবে।

করমগীতের বেশীরভাগ গীত পারিবারিক গীত হলেও বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনাও এতে চিত্রিত হতে দেখা যায়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত এই গীতটিতে পরিলক্ষিত হয়—

১। পল্টনে দেস লেলা ঘেরি
লো সহচরি।
দেসে লড়হাই হেলেইক ভারি
লো সহচরি।

তেমনি কোন দুর্ঘটনা যেমন একটি উল্লেখযোগ্য রেল দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গীত—

সাঁওতালডিহে রেল চলেই, ভজুডিহে সিটি মারেই
পেনসিলডাঙ্গাই পেনসিলডাঙ্গাই
গাড়ী উলটি গেল রে
বিপদ ঘটি গেল।
ডাইবরসালে ডাইবরসালে
মনে মনে সেল রে
বিপদ ঘটি গেল।

বহু করমগীতে এতদঞ্চলের জীবনযাত্রার সুন্দর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন—

১। সাগ তড়ল লতপতি, মাছ ধরলঁ গেঁতা লো
সাসঘারেক গাইর মাইর হিআঞ আহি গাঁথা।

২। এক মুঠা চার মঞা গ মাড় রাধলঁ
সঞা হামর রহলঅ উপাস
কিনা কহবঅ অকে মর ভেলি ডেরি
তাকর তেঁহেঁ মনওআ উদাস।

৩। বা।সিমাড় বাসিমাস সেহ বরুং ভালঅ গ
দিনে তিনধাঁউ নহই ভাল অ জপহাইরেকর লেট অ।

৪। ফুড়কি ছাতিক বেসাতি বাসিআম দেওএ জাবলো
হেলাভেল্যা খালভরারাফ বরদ ঘুরাই দেব।

প্রথম গানটিতে একটি মেয়ে তার দারিদ্রের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীর নির্যাতন ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয় গানটিতে শ্বশুর বাড়ীর প্রচণ্ড দারিদ্র সত্ত্বেও তার স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। গানটির মধ্য দিয়ে সে ব্যক্ত করছে, একমুঠো চাল নিয়ে সে মাড়ভাত রান্না করল, তার ছেলে বা অন্য কাউকে সেটা খাওয়াতে হোল, এর ফলে তার স্বামী উপবাসী রইল এর জন্য তার মন উদাস। তৃতীয় গানটিতে অন্নাভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে যাতে তারা বাসি ভাতও জোটাতে অক্ষম এবং ভুট্টা সেদ্ধ খেয়ে দিনযাপনে তারা বিরক্ত হয়ে পড়েছে। চতুর্থ গানটিতে ঝাড়খণ্ডী মানসিকতা যে কত অল্পে সন্তুষ্ট এবং জীবনধারণের এই স্বল্প উপকরণের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে নিতে পারে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। একটি মেয়ে ব্যাঙের ছাতা দিয়ে তরকারী রান্না করে ক্ষেতে কর্মরত স্বামী, দেওরের খাবার পৌঁছে দেবার কথা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্যক্ত করছে এবং মাঠে যখন তারা খাবার খাবে তখন সে তাদের হালের বলদকে মাঠে চরাবে। স্বামী ও দেওরের প্রতি তার যে "হেলাভেল্যা খালভরা" সম্বোধন তাতে তাদের সঙ্গে তার অতি মাধুর্যমণ্ডিত সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে।

গলামারাঞঃ মিটিন হেলেইক, গাঁও গাঁও চিঠি গেলেইক
অগ সসি মাহতঞ. সসি মাহতঞ ডাকলঅ মিটিন।
ঘুঘড়ি মুরগি ছাড়াছাড়ি বামহন লেইকে বিহাকরি
অগ রাঁড়বেটি, রাঁড়বেটি ঘুরহঅ মাঝাঞ।

উক্ত গীতটিতে কুড়মিদের (মাহাত) ক্ষত্রিয় আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে মেয়েদের প্রতিবাদ গীতের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

উক্ত গীতে বলা হয়েছে গোলামারা গ্রামে শশী মাহতি মিটিং ডাকল. গ্রামে গ্রামে চিঠি পাঠানো হোল এবং মিটিংএ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল যে মুরগী পোষা বন্ধ করে, ব্রাহ্মণ নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান করতে হবে। সাঁঘা বা দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করতে হবে এবং তার ফলেই সমাজে আজ বিধবা মেয়ের ভীড়।

এরকম অসংখ্য করমগীত এখনও প্রচলিত আছে যাতে পুরুলিয়া বা সংলগ্ন অঞ্চলের সমাজ এবং সমাজ বিবর্তনের গতিপথকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন 'করম পরব' বা 'জাওয়া পরব' কুড়মিদের (মাহাত) দ্বারা যেভাবে পালিত হয় অন্য কোন সমাজে সেভাবে পালিত হয় না। পুরনো করমগীতগুলি সবই কুড়মালি ভাষায় রচিত এবং এগুলি মেয়েদের দ্বারাই রচিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার প্রভাবে ঝাড়খণ্ডী বাংলাতেও প্রচুর করমগীতি রচিত হয়েছে। করম পরব অনুষ্ঠানে এখানকার সমস্ত জাতিগোষ্ঠীই অংশ নেয়।

করম পরব উপলক্ষ্যে যে সমস্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির মধ্যে শীতলপুরের ডুংরির মেলা, বওআ ডুংরির মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। করম পরবের দিন ব্রতী মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ফুল তুলতে স্থানীয় ডুংরী, পাহাড় বা বনে চলে যায়। ঐদিন কোন বিশেষ স্থানে বিভিন্ন গ্রামের মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচগান করে সারাদিন কাটিয়ে দেয় এই ভাবেই শীতলপুরের ডুংরী বা বওআ ডুংরির মত কিছু মেলা গড়ে উঠেছে। তবে করম মেলার বিশেষত্ব এই যে এই মেলায় পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে না, এই মেলা একান্তভাবে মেয়েদের। এই মেলাগুলি এক কথায় মেয়েদেরকে প্রাণখোলা ভাবে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়। ইদানীং কালে এই মেলাগুলিতে বর্ণহিন্দু তথা উচ্চবর্ণের মেয়েদেরও ব্রতী হিসেবে না হলেও দর্শক হিসেবে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সুতরাং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির সংযোগমাধ্যম হিসেবে করম পরবের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিম সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতার যে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হোত করম পরব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঝুমুর ঃ

পুরুলিয়া তথা ঝাড়খণ্ড এলাকার লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোক-সাহিত্য, লোকভাষা, লোকসংস্কৃতি এক কথায় লোকজীবনের কোন অঙ্গকেই ঝুমুরকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। ঝুমুরের প্রভাব এই এলাকার জনজীবনের সবকটি প্রশাখাতেই অপরিসীম। করমগীত একান্তভাবেই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শীদের প্রভাব ওতে পড়েনি। কিন্তু ঝুমুর এই এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকমাধ্যম এজন্য প্রায় সমস্ত প্রকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রচারকগণ দ্বারা ঝুমুর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ঝুমুর বিষয়বস্তু, সুরবৈচিত্র, রচনাশৈলী, ভাষা, আঙ্গিক ইত্যাদির বৈচিত্র নিয়ে এক বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

করম পরব যেদিন শেষ হয়, করমপূজা শেষে করমডালকে ঘিরে সেইদিন থেকেই "ডাঁইড় ঝুমুর" বা "ডাঁইড় নাচের" আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মেয়েরা এই ডাঁইড় নাচের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। এখনও কোথাও কোথাও তা প্রচলিত আছে। করমগীতে যদিও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না তবু বহু করমগীত "ডাঁইড় ঝুমুর" হিসেবে "ডাঁইড় নাচে" ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বেশ কিছু ঝুমুরে করমের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—

অজইধ্যা নগরে করমা ভেল
আজা, চালা হো করমা খেলে জাব্।

তাছাড়া করমগীতের ভাষা এবং পুরনো ভাদরিআ বা ডাঁইড় ঝুমুরের ভাষা ও রচনাশৈলীর সাদৃশ্য হেতু অনেকে করমগীতকেই ঝুমুরের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঝুমুরের আদিরূপ যে ভাদরিআ ঝুমুর বা

ডাইড় ঝুমুর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভাদরিআ ঝুমুরের মধ্যে ঝিঙাফুলিআ, মুদিআলি, টামড়িআ, গোলআরি, পাটিআমেধা, আড়-খেমটা, ঝুঁটিআমাজা, রসরসিআ, রসপখিআ ইত্যাদি বিভিন্ন সুর ও তাল আছে, কিন্তু ভাদরিআ ঝুমুরের আদি ভাষা ছিল কুড়মালি এবং এতদঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাই ছিল এর বিষয়বস্তু। যেমন—

১। মঁঞ তঅ গাঁও জাম
বিহানে জনহাইর কুটি দিহা।

২। মাএঃ বেটি নিদাই গেল
ফড়কি তঅ নেহি দেল
খুখড়ি কটাইসে লেগি দেল সে সজনি।

৩। দিন গেলা চলি রে মন
দিন গেলা চলি
মিছাই রে মানুস জনম
ঝিঙা ফুলেক কলি রে মন
দিন গেলা চলি।

৪। মওহা ভুজইতে খাপইর
ফুটি গেল
মুহজারাঞঃ পুঁঠাএঃ পিটি দেল।

প্রথম গানটির বিষয়বস্তু হোল—আমি অন্য গ্রামে অর্থাৎ কুটুম্ব বাড়ীতে যাব, সকালে জনহাইর অর্থাৎ ভুট্টার ছাতু তৈরী করে দিও। দ্বিতীয় গানটির বিষয়বস্তু হোল—মা ও মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, ফড়কি অর্থাৎ বাঁশের তৈরী দরজা বন্ধ করল না, সুযোগ পেয়ে 'কটাস' অর্থে খট্টাস (বিড়াল জাতীয় প্রাণী) ঘর থেকে মুরগী নিয়ে পালাল। তৃতীয় গানটিতে এখানকার অশিক্ষিত জনগণের জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। গানটিতে লোককবি বলছেন, দিন চলে যাচ্ছে, এই মনুষ্য জনম ঝিঙাফুলের কলির মতই অনিত্য। ঝিঙা ফুল যেমন সান্ধ্যের সময় ফুটে

সকালে ঝরে যায় তেমনি এই জীবনও ঝরে যাবে। চতুর্থ গানটির বিষয় হোল—মহুয়ার ফুল ভাজতে গিয়ে মাটির পাত্র (খাপইর) আগুনের তাতে ফেটে গেল তাতে রুষ্ট হয়ে মেয়েটির স্বামী তার (পুঁঠায়) কোমরের উপরে পিঠের দিকে লাঠি দিয়ে পেটাল।

এই সমস্ত গানগুলিতে এই এলাকার মানুষের কি নিরাভরণ জীবন-যাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে তা কল্পনা করা যায় না। এবং অতি তুচ্ছ বিষয় থেকে জীবনবোধের চূড়ান্ত ভাবনাও কত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে অবলীলাক্রমে যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

এই ভাদারিআ ঝুমুরগুলি একান্তভাবেই লোকসঙ্গীত। এগুলিতে রচয়িতার নাম উল্লিখিত নেই। এগুলিতে ব্যক্তি মালিকানা না থাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক মালিকানা। এগুলি সমাজের, সমাজের জীবনদর্পণ, জীবনদর্শন। এগুলি ঝাড়খণ্ডের এক প্রান্ত থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে গণমানুষের মনে সঞ্চারিত করতে থাকে নামহীন লোককবির অমূল্য ভাবনাসম্পদ।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে 'ভাদরিআ' ঝুমুর, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে চৈতালি, উধওআ, আষাঢ় শ্রাবণে কবি ঝুমুর ইত্যাদি বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুরের ঝুমুর তো আছেই, উপরন্তু নাচনীশালীয়া বা দরবারী ঝুমুর গাওআ হয় সারা বছর ধরেই। তাছাড়া, ডাঁইড় নাচ, পাঁতা নাচ, কাঠি নাচ নাচনি নাচ, বাঈ নাচ, মলহরিআ নাচ, ঘোড়া নাচ, ভগতা নাচ, ছও নাচ, মাছানি, বুলবুলি, রাসধারী ইত্যাদি সর্বত্রই বিভিন্ন সুরের ঝুমুরের একছত্র আধিপত্য দেখে এর বিশাল জনসংযোগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ইত্যাদি বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রচারকগণের দৃষ্টি সহজেই ঝুমুরের উপর পড়েছে এবং বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রচারমাধ্যম হিসেবে ঝুমুর ব্যবহৃত হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড এলাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিষয় যুক্ত হয়। কীর্তনের সুরের সঙ্গে ভাদরিআ

ঝুমুরের সুর সহযোগে এক নতুন ধরণের ঝুমুরের আবির্ভাব ঘটে। যাকে দরবারী ঝুমুর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দরবারী ঝুমুর. নাচনী বা বাঈদের আবির্ভাবের পরে রাজা জমিদারদের দরবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সুরবৈচিত্র আনে। ভাদরিআ ঝুমুরের কুড়মালি ভাষার পরিবর্তে ঝুমুরের ভাষা হয়ে যায় বাংলা. হিন্দী, ওড়িয়া ইত্যাদি। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী দীনা তাঁতি, বরজুরাম ভীমা, তুলসী, বাউলদাস. উদয় কামার, চামু কামার. গৌরাঙ্গিয়া মালহার প্রমুখ লোক-কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ তথা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে ঝুমুরের ভাণ্ডার ভরে দেন। সৃষ্টিধর সিং মাহাত. রামেশ্বর সাধু, বিনন্দ সিং প্রমুখ সন্ত কবিরা বাউল তথা সুফী সম্প্রদায়ের দেহতত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়েও প্রচুর ঝুমুর রচনা করেন। এইভাবে ঝুমুরের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে এক ধর্মীয় প্রতিযোগিতা যার মাধ্যমে এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠী-গুলি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অধ্যাত্মবাদ, দেহতত্ববাদ, নিরাকারবাদ, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড, নিবর্তনতত্ব, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পরিচিত হতে থাকেন।

পরবর্তীকালে, শ্রেণীসংগ্রাম. ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, নির্বাচনী প্রচার, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি বিভাগের প্রচার, স্বাধীনতা আন্দোলন, পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলন, বঙ্গভুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, জঙ্গল আন্দোলন, অনুন্নত শ্রেণীর আন্দোলন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি হাজারো বিষয় ঝুমুরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্যই তাতে বাংলা হিন্দী ওড়িয়া ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লোককবি এর পুরনো ভাষা কুড়মালিকেও ব্যবহার করেছেন সুন্দরভাবে। এঁদের মধ্যে ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, সৃষ্টিধর সিং মাহাত, রামকুমার মাহাত, সুনীল মাহাত, বিজয় মাহাত, গৌরীনাথ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত, হাজারী রাজোয়াড়, অমৃত সহিস, কৃত্তিবাস কর্মকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক কবিই শাস্ত্র আদি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের চিত্রও তুলে ধরেছেন

ঝুমুরের মধ্যে, কখনও বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে দৃঢ়কণ্ঠে। বিভিন্ন পর্যায়ের কতকগুলি ঝুমুর এখানে উদ্ধৃত হোল—

১। (রামায়ণ)

শক্তিশেলে যবে পড়িল লক্ষ্মণ
কাঁদেন শ্রীরাম রাজীব লোচন
ভাসেন নয়ন নীরে—
হায় রে লক্ষ্মণ কেন রে শয়ন
মধ্য রণ পারাবারে
উঠ উঠ বীর ধর ধনুতীর
দশশির বধিবারে।

—ভবপ্রীতা

২। (দুর্গা পূজা)

পাটার উপর দিএঃ খুঁটি
তার উপরে খড় মাটি, বেঁধেছে মা জোরে
তার উপরে তুঁষ মাটি দিয়েছে ছুথারে
মায়ের রূপে মন হরে
এই মাটি রূপে ভুলালে আমারে।

—রামেশ্বর

৩। (কালী পূজা)

পাতালেতে ছিলে কালী
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নিয়ে আলি
মাগো ওমা কালী, মর্তভুমে এসে পূজা লিলি।

৪। (অধ্যাত্ম)

ভুঁসা কুটইতে নর
বিসরলাই হরিহর
অন্তকালে পন্থ ভুলি গেলা।

—বিনন্দিয়া

৫। (অভিমন্যু বধ)

জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠির
কোথায় পিতা পার্থবীর
কোথা আছ হে মামা শ্রীমধুসূদন
বিপদ সময়ে আমায় দাও দরশন।

৬। (প্রেম)

এ ছার দেশে না রহিব
পীরিতি নগরে যাব
বেছে লিব রসিক সুজনা
প্রাণ বন্ধু হে পীরিতি রতন কাঁচা সোনা।

—হাড়িরাম

৭। (রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহ)

যার জন্যে গোচারণ মস্তকে রাধাবহন
যার জন্যে শিখিলাম বাঁসুরি
যার জন্যে ঘাটে দাঁড়ি, যমুনায় বাহি তরণী
যার জন্যে গিরি করে ধরি
সে রাধা ত্যজিল মোরে কাজ কি আর এ সংসারে
রব না আর ব্রজপুরে, হব কাশীবাসী গো বৃন্দে
বস আমি আসি।

৮। (নির্বাচনী ঝুমুর)

আলে রে ভাই আলে ভোট
সবাই মিলে বাঁধ জোট
ভোট দিব হে হামরা ধনুকের মাঝে
ঝাড়খণ্ড অলগ করার কাজে।

—কৃত্তিবাস

৯। (ঝাড়খণ্ড আন্দোলন)

ঝাড়খণ্ডেক মাটি কাঁদেইরে
গিরি জাইকে পরেক ফাঁদে
সভিনে আজাদি পাওলা
হামরাই পরেক বশে রে ভাই
বেইমানিকর দসে।

—জগন্নাথ

১০। (জঙ্গল আন্দোলন)

পাত তুলি নিতি নিতি
ঝুড়ি ঝাঁটি দতইন কাঠি
আঁইজ কেনে বাবুই করে মানাগ
উআদের বন নাই ছিল জান।

—সুনীল

১১। (শ্রেণী সংগ্রাম)

হাঁথ বাঁধল গড় ছাঁদল
পাথড়ে জাঁকাওল মন
পতরি দেলাহাথুন আঁইথমু কানওআ
জিবন বাঁচা বেড়ি দাইরে
ছওআ পুতানি কাঁদি মেনাই খুন
জামনকে দেলথুন ভিজাইরে।

—সুনীল

১২। (জীবন যাত্রা)

ঝাড়গাঁর হাট গাতে
বেহাইএ ধরলঅ হাঁথে
বেহাই ছাড় হাঁথ
ঝুড়ি ঝাঁটি বিকেই সাঁঝর ভাত।

—বিজয়

১৩। (খরা)

১৩৮৯ সালে, ধান গেলি রসাতলে
খেত দেখি, দিসা উড়ি জাই
ধান চালে গে
মারাফরি জাব খাটেলাই।

—রামকুমার

১৪। (বঙ্গভুক্তি বিরোধী)

হামে না জাইব বাঙ্গাল হো
হামে না জাইব বাঙ্গাল।

(সৃষ্টিধর)

১৫। (বাস্তহীন করার বিরুদ্ধে)

বনবাদাড় কাটিকুটি বাঘভালুক ঢাড়াই পিটি
বসমতাঞ বনাওলঁ বসতি
আইজ সে বসতি পানিঞ ডুবাই দেলরে
হিরদয়ে নিরদয়ে শেল।

১৬। (ভূমিহীন করণের বিরুদ্ধে)

মরদ জেনি খটি লুটি, সাঁজবিহান মাটি কাটি
খেতি বাড়ি বনাঞলঁ সুথর হে
আইজ মে খেতি কারখানাঞ লুটি লেলরে
হিরদরে নিরদইঅ সেল।

১৭। (অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে)

হামরাক গেলি জমিজমা
হামরাক চইখেই খেদাধুঁআ
মুখখু ছাওআ বগিলি খাটি খাঞরে
নমারিঞ বাহারি সউর বহালি ভেলরে
হিরদইঞ নিরদইঅ সেল।

১৮। (গণ আন্দোলনের ডাক)

মারাংবুরুঞ জনম দেলও
জীবনেক কি দাম ভেলও
ভুখে মরি মরণ কেইসন রে
খেলা একেবারে বাঁচা মরাক খেইল রে
হিরদইএ নিরদইঅ সেল। ইত্যাদি

পুরুলিয়ার ছো-নাচ ঃ

পুরুলিয়ার ছো-নাচ বর্তমানে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ছো-নাচ তার নিজস্ব পরিমণ্ডল পেরিয়ে দেশ বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। সুতরাং পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যেরও লড়াই জমে উঠেছে মন্দ না। আমরা সে সমস্ত বিতর্কে না গিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই লোকমাধ্যম তথা সংযোগ মাধ্যম বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

আগেই বলা হয়েছে পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে মানভূম সংস্কৃতি বললেও এর সঠিক ব্যপ্তি বোঝানো যায় না। ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতিই এর সত্যিকারের পরিচয় এবং আমরা যদি ঝাড়খণ্ডের মূলবাসী, আদিবাসীদের আরণ্যক জীবনযাত্রা মানসিকতার গভীরে এগুলির উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হই তাহলেই সাফল্য আসতে পারে এবং আলোকপাত হতে পারে অতীতের অন্ধকারে।

করমগীতে পাওয়া যায়, "জাহু জাহু করম গুঁসাই জাহু ছওঅ মাস গঅ, পড়তঅ ভাদরঅ মাস আনবঅ ঘুরাই।" করমের বিসর্জনকালে মেয়েরা বলছে গানের মাধ্যমে, যে করম ঠাকুর তুমি যাও ছ' মাস পরেই আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনব। এর থেকে বেশ কিছু গবেষক ভাবছেন এই অঞ্চলে বা এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে ছ' মাসে বছর গণনা প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ এই ছ' মাসকে মধুমাস, লিরন মাস, রপা মাস, ভাদর মাস, কাটনি মাস এবং জাড় মাস বলে অনুমান করেছেন।

এই অনুমান ঠিক বা ভুল সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা বলতে পারি এখানকার আদিম অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব কৃষি ভিত্তিক বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী পরিচালিত হত এবং তা এই এলাকার পক্ষে অবৈজ্ঞানিক ছিল না।

১লা মাঘকে এ অঞ্চলে এখনও কৃষিবর্ষের প্রথম দিন হিসেবে মানা হয়। সেদিনই আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম হলকর্ষণ শুরু হয়। সূর্যের উত্ত রায়ণকে লক্ষ্য করেই যে এই অনুষ্ঠানটি প্রচলিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। এই দিনটি এই অঞ্চলে "আখান জাতরা" নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিক হলকর্ষণ ছাড়াও এদিন 'বেঝা বিঁধা', 'জাতরা উড়া', 'গরাম ভানসিং', 'জাহির থান', 'গঁসাহ এরা'র পূজা, ভানসিং-এ 'ঝুপান' ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। এরপর সিঝান পরব বাদ দিলে এই এলাকার জনমনের প্রধান আকর্ষণ 'কুঁঢ়া পরব', চৈত সাঁকরাইত', 'শিব গাজন' এবং শিব গাজনকে উপলক্ষ্য করে কাপ ঝাঁপ, ভগতা নাচ, মাছানি, ভগতা ঘোরা, জিভ ফোঁড়া, পিঠ ফোঁড়া ইত্যাদি যন্ত্রণাদায়ক কৃচ্ছ্রসাধনও ছো-নাচের উদ্দামতা। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষে বর্ষা নামা পর্যন্ত চলতে থাকে বিভিন্ন গ্রামে শিব-গাজনের উৎসব।

বারুনি, রহনিতে বীজ বপন শেষ করে জাঁত গান, মনসা পূজা, করমে মেয়েদের শষ্য ও সন্তান কামনা, ভাদ্র মাস জুড়ে ইঁদ, ছাতা, ভাদু আর পাঁতা নাচ করম নাচ, ডাঁইড় নাচ, জিতিআ পরব। নতুন ফসল ঘরে আনার অনুষ্ঠান সহরই বাঁদনা এবং ধান ঘরে তোলার পর মকর সংক্রান্তিতে বা সারা পৌষ মাস জুড়ে টুসু পরবের প্রস্তুতি।

এক কথায় এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি এবং এই কৃষিকে ভিত্তি করেই সারা বছর ধরে বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের উপযোগী করে সৃষ্ট হয়েছে নানান পালা-পার্বণ নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান। এই ধারণাকে মেনে নিয়ে বিচার করলে আমরা এখানকার পালা পার্বণগুলিকে এই ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি।

আখানজাতরায় প্রথম হলকর্ষণ এবং দেবতা বা প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট

রাখার জন্য গরাম জাহির, ভানসিং ইত্যাদি দেবতার পূজা, ফসলের সুরক্ষার জন্য শক্তি পরীক্ষার অনুষ্ঠান বেঝাবিঁধা। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত প্রচণ্ড খরায় প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং জলের প্রার্থনায় শিব গাঁজনকে উপলক্ষ্য করে নানান কৃচ্ছ্রসাধন, শ্রাবণে সর্পদেবীর পূজা এবং করমে ফসল ও সন্তান কামনা। জিতিআ সহরাই এ ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি। চাষের সহযোগী গরু মহিষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং টুসু পরব শস্য ঘরে তোলার পর উদ্দাম আনন্দের পরব, বিজয়ের পরব।

কৃষিকার্মের উপর নির্ভরশীল মানুষদের কাছে তথা খরা-প্রবণ এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আষাঢ় বৃষ্টি শুরু পর্যন্ত "লিরন মাস" যেন অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। আদিম মানুষের মনে দেবদেবীর ধ্যান-ধারণা জন্মানোর আগে বৃষ্টিহীন, নির্মম, ধূ ধূ করা, তৃষ্ণাকাতর "লিরন মাস" প্রকৃতির কোপ হিসেবেই চিহ্নিত হোত তাই প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন জাদুক্রিয়ার আয়োজন ও কৃচ্ছ্রসাধন শিব গাজনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে। আদিম মানুষের প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন জাদুক্রিয়া একত্রিত হয়েছে শিব গাজনের রূপ ধরে।

লোহার শলাকা দিয়ে পিঠ ফোঁড়ানো, জিভে ফোঁড়ানো, ভগতাকে পিঠ ফুঁড়ে ঘোরানো ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধনা যে বৃষ্টি কামনায়, একথা অনুমান করা কষ্টকর নয়। বৃষ্টি কামনায় বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন আচার যেমন ওঁরাওদের মেঘ গর্জনের অনুরূপ আওয়াজ করে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে দেওয়া, কারও কারও আগুন জ্বালিয়ে মেঘের মত ধোঁয়ার সৃষ্টি করার মত শিব গাজনের বিভিন্ন আচারেও বৃষ্টি কামনার ইঙ্গিত আছে।

শিব গাজনের কাপ ঝাঁপ থেকেই 'মাছানি', 'ছো' নাটুয়া বৃদ্ধি পেয়েছে একথা ঠিকই কিন্তু ছো-নাচের মধ্যেকার প্রচণ্ড শারীরিক কসরত, গতি এবং উদ্দামতার মূলে ক্রিয়াশীল আদিম মানুষের বৃষ্টি কামনার জাদুবিলাস, জাদুক্রিয়া এবং কৃচ্ছ্রসাধন। ছো নাচ সম্পর্কে আলোচনা

করাতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই আদিম জাদুবিশ্বাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

শিব গাজনের কাপ ঝাঁপে অংশগ্রহণকারীরা সঙ সেজে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করত। বনের পশু জন্তু জানোয়ারের চালচলন অনুকরণ করত। ভগতা নাচের বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশঃ তা নাচের মাত্রা পেল এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন সুর ও তাল তাতে যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধি আনল। গাজনের কাপ ঝাঁপ ধীরে ধীরে যৌথ নৃত্য এবং 'একৈড়া' বা 'ওস্তাদী' নাচে রূপান্তরিত হল।

এক দিকে যেমন বিভিন্ন প্রচলিত সুর-তাল যুক্ত হয়ে নাচে ছন্দ এল, অন্যদিকে গাজনের সঙ এর চুন-কালির হাস্যকর সাজসজ্জা বদলে গিয়ে মার্জিত হতে লাগল। এই সময় এই এলাকায় জনমানসে এক দারুণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এখানকার মানুষের মনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে এবং এখানকার লোকসংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে যথা ঝুমুর, জাওয়া, করম, ভাদু, ছাতা, জিতিআ, টুসু, পাঁতা নাচ, ডাঁইড় নাচ ইত্যাদির ন্যায় ছো নাচেও তার প্রতিফলন ঘটে। ছো-নাচে জন্তু জানোয়ার পশুপক্ষীর চালচলন, নাচ এবং ওস্তাদী নাচের সঙ্গে যুক্ত হয় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যনাট্য।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে ছো-নাচে সামিল করার ফলেই শিল্পীদের সাজপোষাকের ক্ষেত্রে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। সাধারণ সাজপোষাক বাদ দিয়ে শিল্পীদের গায়ে স্থান পায় রাজপোষাক এবং মুখে যাত্রাগানের ঢং-এ পেন্টিং। ছো-নাচের এই রূপ এখনও ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এলাকার ছো-নাচে আছে। কিন্তু পুরুলিয়া তথা মানভূমের ক্ষেত্রে পেন্টিং-এর বদলে উঠে আসে কাঠের মুখোশ দেবদেবীর মুখশ্রীর আদলে। চড়িদার সূত্রধররা ক্রমে কাঠের মুখোশও পরিত্যাগ করে তৈরী করেন ওজনে হালকা, নাচের উপযোগী কাগজের মুখোশ। যার নির্মাণ কৌশল দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হতে হতে বর্তমানে শিল্পের

বাহার

স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে ছো নাচ সুর-তাল, আঙ্গিক, নৃত্যশৈলী, সাজসজ্জা, কাহিনীবিন্যাস ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে এক বিস্ময়কর পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

পণ্ডিতগণ তর্ক জুড়েছেন, কেউ বলছেন ছো এসেছে 'ছায়া' থেকে, কেউ বলছেন, ছো এসেছে 'ছাউনি' থেকে, আবার কেউ বলছেন, ছো এসেছে 'সঙ' থেকে। কেউ বলছেন, ছো-এর নাকি ছটা তাল আছে তা থেকে ছ'নাচ ক্রমে ছো-নাচে রূপান্তরিত হয়েছে। যাই হোক, 'ছো' আবার 'ছোওআ' বা 'ছওনা' থেকেও আসতে পারে। কুড়মালিতে ছেলেকে 'ছওআ' বা 'ছওনা' বলে। ছো নাচে এযাবৎ ছেলেদেরই অংশগ্রহণ ছিল সেজন্য একে 'ছওআ-নাচ' বা 'ছওনা-নাচ' বলা যেতে পারে এবং কালক্রমে তা ছওনাচ হয়েছে বলাও বোধহয় অযৌক্তিক হবে না।

পুরুলিয়ার গণমানুষ সম্পূর্ণভাবেই কৃষি নির্ভর কারণ এখানে এখনও শিল্পায়ন ঘটেনি। রুক্ষ, সেচহীন, অনুর্বর পুরুলিয়ার জমিতে কৃষিকর্ম প্রায় অনিশ্চিত। এক ফসলী এই জমিতে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের কাজ থাকে বড়জোর তিন মাস। বাকি ন' মাসই তারা কর্মহীন। অথচ এখানকার মানুষ প্রচণ্ড পরিশ্রমী। তাদের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সারা এলাকা জুড়ে শিবগাজন আর ছো-নাচে জড়ো হয় হাজারে হাজারে দর্শক। প্রতিটি মেলা পরিণত হয় জনারণ্যে। ছো-নাচের সাজপোষাক, মুখোশ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির খরচ অনেক বেড়ে গেছে, ছো-শিল্পীরা দেশ বিদেশে নাচ দেখিয়ে এসেছেন। গম্ভীর সিং মুড়া এবং নেপাল মাহাত পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছেন ছো-শিল্পী হিসেবে কিন্তু ছো-শিল্পীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এখন পর্যন্ত। বাড়েনি সামাজিক মর্যাদা, জীবন-যাত্রার মানও হয়নি উন্নত।

সাজগোজ সুরতালে বৈচিত্র এলেও ছো-এর বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য

পরিবর্তন ঘটেনি। ছো-শিল্পীরা প্রায় সবাই এসেছেন কৃষক, শ্রমিক এবং বৃত্তিজীবি শ্রেণীর দরিদ্র পরিবার থেকে অথচ ছো-নাচ এখনও তাদের হাতে সামাজিক বিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি। অনেকেই প্রচলিত লোকসংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু পৃথিবীর সবকিছুই যখন পরিবর্তনশীল তখন ছো-নাচে নতুন চিন্তাভাবনা না এলে গতানুগতিকতা তাকে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে গ্রাস করে ফেলবে।

'সেণ্টার ফর কম্যুনিকেশান এণ্ড কালচার‍্যাল এ্যাকশান'-এর পক্ষ থেকে গত বছর একটি ওয়ার্কশপ করা হয় পুরুলিয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। পুরুলিয়ার জনপ্রিয় ছো-দলগুলি থেকে শতাধিক শিল্পী এই চার দিনের ওয়ার্কশপে মিলিত হয়ে ছো-নাচে নতুন নতুন পালা তৈরী করতে সচেষ্ট হন। ছো-শিল্পীরা ওয়ার্কশপে তৈরী তিনটি সামাজিক সমস্যামূলক পালা ওয়ার্কশপের শেষে রাত্রিতে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেন। পালা তিনটি হোল যথাক্রমে খরা, মদ খাওয়ার পরিণাম এবং কৃষিজীবি পরিবারে ভাঙন। সকলের মনেই সন্দেহ ছিল মুখোশ ছাড়া এই নতুন ধরণের পালাগুলি দর্শকদের খুশী করতে পারবে কিনা। কিন্তু নতুন এই পালাগুলি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। এই ওয়ার্কশপের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি ছো-দলের ক্ষেত্রেই। পৌরাণিক পালার সঙ্গে সঙ্গে ছো-তে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ ইত্যাদি এবং সেই সঙ্গে খরা উদ্বাস্তুকরণ, ট্রেন দুর্ঘটনা ইত্যাদি সামাজিক পালা। অবশ্য এর আগেও অল্প কিছু জায়গায় ছো-নাচে সামাজিক পালা গণচেতনা-মূলক পালা করার প্রচেষ্টা হয়েছিল যেমন শহীদ শক্তি মাহাত, শহীদ বৃহস্পতি মাহাত পালা ইত্যাদি।

ছো-শিল্পীদের ধীরে ধীরে চেতনার বিকাশ ঘটছে। তারা সংগঠিত হয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে আগ্রহী। তাদের এরকমই একটি সংগঠনের নাম "মানভুম জন জাতীয় সংস্কৃতি সংসদ"। ছো-নাচের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার দরুণ এর পরিধিও দিন দিন

প্রসারিত হচ্ছে এবং জনসংযোগ এর ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে, সুতরাং গণচেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিকল্প মাধ্যম হিসেবে ছো-নাচ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

লোকনাট্য 'মাছানি' ঃ

কতদিন থেকে পুরুলিয়াতে "মাছানি" অনুষ্ঠিত হোত একথা অবশ্যই এখন নিশ্চিত করে বলা যায়না তবে বিগত পনেরো/কুড়ি বছর আগে থেকে "মাছানি" প্রায় অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে।

কুড়মালি ভাষায় দুই জনের বয়স উচ্চতা, দৈহিক গঠন ইত্যাদিতে সাদৃশ্য থাকলে তাদের বলা হয় "জড়িমাছা"। এই "জড়ি মাছা" থেকেই সম্ভবতঃ "মাছানি" কথাটা এসে থাকতে পারে। অনেক সময় "মাছি" থেকে "মাছা" বা দেহের অঙ্গবিশেষকেও "মাছা" বলা হয়। তবে "মাছ" থেকে "মাছা" কথাটা পুরুলিয়াতে ব্যবহৃত হয় না।

"মাছানি" অনুষ্ঠানে মাছানি কথাটা যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে "মাছানি" বলতে অভিনয়কে বোঝায়। এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে "জড়িমাছা" থেকেই "মাছানি"র উদ্ভব বলে মনে হয়। দুই ব্যক্তির সাদৃশ্যের মতই একটি চরিত্র বা একটি ঘটনা বা একটি কাহিনীকে অনুরূপভাবে উপস্থাপিত করাকে "মাছানি" বলা যেতে পারে।

পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত একাংক ধর্মী, গীত, নৃত্যবহুল লৌকিক কাহিনী, ভাষা ইত্যাদি সম্বলিত লোকনাট্যকলার নাম "মাছানি"। মাছানিতে কখনও কুড়মালি, কখনও ঝাড়খণ্ডী বাংলা ব্যবহৃত হয়। মাছানির গানে ঝুমুর ও প্রচলিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহৃত হয়।

ছও নাচের মত চৈত্র সংক্রান্তি থেকেই মাছানি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। শিব গাজনের কাপ-ঝাঁপ থেকেই যে "মাছানি" বৃদ্ধি পেয়েছে একথাও বলা যায়। মাছানিতে সাজগোজ হিসেবে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া জামা-কাপড় ব্যবহৃত হয়। মেকআপের ক্ষেত্রে খড়িমাটি, চুন, কালি, লাল রং ইত্যাদিকেই যথেষ্ট মনে করা হয়।

পুরুলিয়াতে প্রচলিত আরেকটি লোকনাট্যের নাম বুলবুলি। বুলবুলি "মাছানি"র মত নৃত্যগীতবহুল হলেও এতে "দানবীর হরিশ্চন্দ্র" ইত্যাদি পালা যুক্ত হয়েছে এবং সাজগোজের মাত্রাও যুক্ত হয়েছে। "মাছানি" ও "বুলবুলি" দেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বহু পুরনো দিন থেকে পুরুলিয়াতে দুটি লোকনাট্যের ধারা চলে আসছিল। বর্তমানে পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে বাংলা যাত্রাভিনয়ের চলন শুরু হওয়ার ফলে এবং শিক্ষিত সমাজের অবহেলার ফলে "মাছানি" ও "বুলবুলি" প্রায় অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। অথচ "মাছানি" দেখে এর প্রচুর সম্ভাবনা আছে বলেই মনে হয়।

মাছানিতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, ঝুমঝুমি, আড় বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। পাত্রপাত্রীদের গীতের সঙ্গে সঙ্গে দলের বেশ কিছু লোক "দহাড়ি" করে। যদিও মাছানি" লুপ্তপ্রায়, তবুও এখনও রামকৃষ্ণপুর (নুতনডি), সুরুলিয়া, গোলকুণ্ডা, বেলমা, মালথোড় ইত্যাদি পাড়া থানা ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে বেশ কয়েকটি "মাছানি"র দল আছে।

দশ বারো বছর আগে আমার গ্রামে (কালুহার) একটি "মাছানি" পালা দেখার কথা মনে আছে। যে পালাটির নাম ছিল "রাইতকাছা জামাই"। কোন এক জামাই রাত্রে দেখতে পায়না সে কোনক্রমে গরুর লেজ ধরে শ্বশুর বাড়ীর গোয়ালে পৌঁছায়। রাতকানা জামাইকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীর লোকের রঙ্গ রহস্য, এই ছিল মাছানিটির বিষয়বস্তু।

পারা থানার রামকৃষ্ণপুরে (নতুনডি) গত ১৬ই ১৭ই মে '৮৫ মানভূম জনজাতীয় সংস্কৃতি সংসদ ও "সারহুল" পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে সি. সি. সি. এ.-এর (কলিকাতা) সহযোগিতায় দু রাত্রিব্যাপী এক লোকনাট্যের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি "মাছানি" পালা দেখার সৌভাগ্য হয়। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণপুর (নুতনডি), মালথোড়, সুরুলিয়া ইত্যাদি গ্রামের চারটি দল অংশগ্রহণ করে। মাছানি দলের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারা যায়, তারা কেউ কেউ কুড়ি/বাইশ বছর, কেউ পনেরো/ষোল বছর, কেউ আবার পাঁচ সাত বছর পরে এই মাছানি

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং সহজসাধ্য কিছু পালা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছে। গ্রামীণ ঘটনা দুর্ঘটনাকে 'মাছানি'তে তাৎক্ষণিক রূপ দেওয়া, 'মাছানি'র যেটা প্রধান বৈশিষ্ট তা তারা করতে পারেনি।

চারটি দল পরপর আসরে অংশগ্রহণ করে যে কটি পালা উপস্থাপিত করে তার মধ্যে "খেপচা লেচা ধুঁধুঁর পেঁচা", "কানা চৌকিদার", "লত্থার পিঠা খাওয়া", "চার জুয়াড়ী", "চার আওআরা", "কুলহুক ঘানি", "খননঅ খচর হড়ফট", "পিঠা ভাগ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই পালাগুলি প্রচলিত পালা বা কাহিনী থেকে অনেক সময় নেওয়া হয় এবং দলের ম্যানেজাররা অনেক সময় ইচ্ছে মতো নতুন সংযোজন কাটছাঁট করে থাকে। পুরনো পালাগুলির পালাকারদের নাম পাওয়া যায় না। দলীয় ম্যানেজাররাও নতুন নতুন পালা রচনা করে।

"খেপচা লেচা ধুঁধুঁর পেঁচা" পালায় কোন কাহিনী নেই। দুই বিকৃতদেহী বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে আসরে বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্য করে ও দর্শকদের প্রচুর আনন্দদান করে। "কানা চৌকিদার" পালায় এক চক্ষুহীনের সংসার, চৌকিদার-এর কাজ এবং পুরুলিয়ার প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি চিত্রিত হয়েছে। "লত্থার পিঠা খাওয়া" পালায় এক পেটুক ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আছে। "চার জুয়াড়ি"-তে চারজন কর্মহীন ছেলে একটি মেয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করে ও বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি তখন তাদেরকে তাদের পেশা, বাড়ীঘরের কথা সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে। ছেলেগুলি পরপর তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় এবং এই উত্তরের মাধ্যমে তাদের চরম দারিদ্র্যের কথা ফুটে ওঠে কিন্তু বলার ভঙ্গীতে তারা দারিদ্র্যকে প্রচণ্ড উপহাস করে উড়িয়ে দেয়। দারিদ্র্যকে, দুঃখকে, যন্ত্রণাকে উপহাস তথা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরাটাই 'মাছানি"র অন্তর্নিহিত ভাব।

"চার আওআরা" পালায় চার জুয়াড়ির বিপরীত, চারটি মেয়ে একটি ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ছেলেটি তখন তাদের বাড়ী, পেশা, জাতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। মেয়েগুলি একে একে তার প্রশ্নের উত্তর

দিয়ে যেতে থাকে গীত এবং নৃত্য সহকারে তাদের দারিদ্র, অসহায়তা, সামাজিক মর্যাদাহীনতা ইত্যাদি ফুটে ওঠে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও উপহাসের মধ্য দিয়ে তারা যেন সমাজকে তীব্র কশাঘাত করে। "পিঠে ভাগ" পালায় তিনটে পিঠেকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, মনোমালিন্য, জীবনযাত্রা ইত্যাদির পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে।

"কুলহুক ঘানি" এবং "খন্নখচর হড়ফট" পালা দুটি এখানে কুড়মালি ভাষায় অভিনীত হয়। "কুলহুক ঘানি"-তে কলুর সামাজিক দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং "খন্নখচর হড়ফট" পালায় তাঁতির জীবনযাত্রা এবং সেকালের সমাজব্যবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে। এক তাঁতি তার বউ-এর সঙ্গে বাড়ীতে বসে নৃত্য ও গীত সহকারে তাঁত বুনছে—তাঁতের শব্দ অনুকরণ করে খন্নখচর হড়ফট দিয়ে গান সমাপ্ত হয় এমন সময় রাজার পাইক বাড়ীতে ঢোকে। তাঁতি তাড়াতাড়ি তাঁতের নীচে লুকিয়ে পড়ে তার অনেক দিনের খাজনা বাকি আছে সেই ভয়ে। পাইক এসে তাঁতির কথা তাঁতির বউকে জিজ্ঞেস করে। তাঁতির বউ তাঁতি বাইরে গেছে বলে মিথ্যে বলে। তাঁতের নীচের দিকে কিছু আছে বলে তাকাতে গেলে তাঁতির বউ বলে, ও কিছু নয়, ওটা আমাদের কুকুরটা ভয় পেয়ে তাঁতের নীচে লুকিয়ে পড়েছে।

রাজার পাইক চলে গেলে তাঁতি বেরিয়ে আসে এবং বউকে মারতে উদ্যত হয়, বলে, "সালি তঁএ মকে কুকুর কহলে ?" তাঁতির বউ উত্তর দেয়, রাজার পাইকের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করলাম সেইটাই ঢের। দর্শকরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে ওঠে। আবার শুরু হয় নৃত্য গীত সহকারে তাঁত বোনা, আবার আসে পাইক। তাঁতি আবার তাঁতের নীচে লুকিয়ে পড়ে। তাঁতি বউ কখনও মুর্গী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বলে তাকে পাইকের হাত থেকে রক্ষা করে। আবার তাদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়, হাসির ফোয়ারা ছোটে এবং শেষ পর্যন্ত রাজার পাইক তাঁতিকে বেঁধে নিয়ে যায় খাজনার দায়ে। হাসি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের এই রকম প্রতিবাদের ভঙ্গীই "মাছানি"র বৈশিষ্ট্য।

"মাছানি" প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও এখনও অবহেলিত রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় পুরুলিয়ার জনসংযোগের ক্ষেত্রে "মাছানি" অদূর ভবিষ্যতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তার অতীত গৌরবকে ততোধিক উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হবে। □

যামিনী মাহাতো

জনসংযোগ ও ঝাড়গ্রামের লোকসংস্কৃতি

-কে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আধুনিক পৃথিবী সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছে। একদিকে ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপন করে প্রযুক্তির এই ধারায় যখন বিপ্লব ঘটাতে ব্যস্ত, সেই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটে চলেছে অন্য এক সংযোগ বিপর্যয়। প্রতি মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান আরও বেড়ে যাচ্ছে। তাই আজ পৃথিবীতে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বিকল্প সংযোগমাধ্যম নিয়ে নানান চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন।

সম্ভবতঃ যখন থেকে মানুষ ভাববিনিময় করতে শিখেছে তখন থেকেই সভ্য হবার পথেও পা বাড়িয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে এই ভাবনার পারস্পরিক সঞ্চার এবং সভ্যতার বয়স সমান।

"আদিম যুগ থেকে আজ অবধি মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে যতই এগিয়েছে ততই তার ভাব সঞ্চারের মাধ্যমগুলি সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর এবং জটিল থেকে জটিলতর এবং ব্যাপক থেকে উত্তরোত্তর অনেক বেশী ব্যাপক হয়ে উঠছে। স্বভাবতই আদিম সমাজের উত্তরসরণ করে এসেছে কৌম সমাজ, যা বিবর্তিত হয়েছে লোকায়ত সমাজে। যা কিনা ফের অগ্রসর হয়েছে পরিশীলিতর শ্রেণী সমাজের দিকে, এই সমস্ত কটি পর্যায়েরই সংযোগ সঞ্চারের বহুজনীন মাধ্যমগুলিও ক্রমান্বয়ে চেহারা এবং চরিত্র বদল করেছে।" (সংযোগ-সঞ্চারণ এবং লোকসংস্কৃতি : পল্লব সেনগুপ্ত)

শিক্ষিত সমাজের মাঝে ভাব-বিনিময়ের যে সমস্ত মাধ্যম আধুনিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যথা সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, থিয়েটার, এগুলি গ্রাম্য

মানুষের ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যই থেকে যাচ্ছে। এক দিকে শহরে শিক্ষিতরা পৃথিবীর আধুনিকতম বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন অন্যদিকে গ্রামীণ জনমানস সেই আলোক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন—তাই উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্নতা-বোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে

ঝাড়গ্রাম ঃ

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই মহকুমা ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু বিচিত্র নীরব ইতিহাসের সাক্ষী। পার্বত্যময় এই উপত্যকায় কুর্মী, সাঁওতাল, মাল, মাহালী, খেড়িয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, দেশোআলী প্রভৃতি আদিবাসী ও মূলবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন, নাচ-গান, দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিবাহ উৎসবে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে ইতিহাসের সেই আদিমতম কাল থেকে।

যদিও এই গোষ্ঠীগুলির এই এলাকায় দেশান্তরীকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক গবেষক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন, তবুও একথা স্বীকৃত যে, এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি আবহমান কাল যাবৎ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একটা সুন্দর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে বসবাস করে আসছে।

আজও এখানকার মানুষ জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে মূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। শিকার ও খাদ্য আহরণকারী গোষ্ঠী, যাযাবর অরণ্য কেন্দ্রিক মানুষ আর আদিবাসী চাষী। ইতিহাসের বিভিন্ন গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণে একথা আজ স্বীকৃত যে, খাদ্য আহরণকারী মানুষ যখন খাদ্য উৎপাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন থেকেই নব নব চেতনার বিকাশ শুরু হয়।

আদিম গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামের গোষ্ঠী, পরিবার, কৌমভিত্তিক জমির যৌথ মালিকানা থেকে সামন্ত, জমিদার ও রাজা হিসেবে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের অভ্যুদয় তেমনি জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের উদ্ভব থেকে দেখা যায় যে, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মুণ্ডা, মাহাতো, মানকি,

পাহান, লায়া দেউরী, মাঝি. পরগণৎ, দেশমণ্ডল প্রভৃতি অর্থ নৈতিক. সামাজিক, ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির মেরুদণ্ড ছিল এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ।

একদা এই জঙ্গলাকীর্ণ ঝাড়গ্রামে জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি কেটে যারা প্রথম গ্রাম স্থাপন করেছিল তারাই প্রথমে গ্রামের সীমানা বেঁধেছিল। তাদের নিজস্ব দেবদেবী "গ্রামথান" বা "জাহের থান" স্থাপন করে পবিত্র শাল গাছের ঝোপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মড়েকো, তুরুইকো, জাহেরএরা. পারগানা বোঙ্গা, আতো বোঙ্গা মারাংবুরু অথবা মহারাই. গোঁসাইরাই, মহাদানা, বড়পাহাড় অথবা সিংবোঙ্গা, চাঁদবোঙ্গা, চণ্ডিয়াশাড়, দাঁসাই-শিণী, কুদরাসিনি, রংকিণী, ঝংকিণী, বারুণী, জিহুড় প্রভৃতি দেবদেবী। গ্রামে যারা বসবাস করত তারাই সেই গ্রামের মাথা, স্থানীয় ভাষায় বলা হয়, মুণ্ডা, মাঝি. মাহাত। তারাই সেই গ্রামে খুঁটকাঠি হিসেবে পরিচিত।

পঁচিশ তিরিশটা গ্রাম নিয়ে নির্বাচিত করতেন গ্রাম-প্রধানরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর পরগণৎ বা পরগণা। আবার ১২টি পরগণা নিয়ে নির্বাচিত হতেন দেশমণ্ডল। অবশ্য মাঝি মাহাতদের মতই পরগণৎ অথবা পারগাণা পদটি জন্মসুত্র থেকেই তাদের প্রাপ্য। এরাই নিজ নিজ এলাকার সামরিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করতেন নিজ নিজ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। এদের কথা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা অমান্য করলে একঘরা বিটলাহা, জলঘটিবন্ধ প্রভৃতি সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হতেন যে কোন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ।

এখানে যারা নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তারা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ডোম, মাহলি, কামার, কুমহার প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। সমতলবাসী কৃষকদের গ্রামেই এদের দু-চার ঘরের বাস। উল্লিখিত এই শ্রমিক-গোষ্ঠীগুলি এখানকার মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী জিনিষপত্র কৃষকদের কাছে বিক্রী করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এদের

অধিকাংশের কথ্যভাষা ঝাড়খণ্ডী বাংলা। প্রতি গ্রামেই এই সমস্ত সম্প্রদায়ের দু-চার ঘরের বসবাস। ফলে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ইদানীং তারা কৃষি-শ্রমিক এবং কখনো কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

ঝাড়গ্রাম এলাকার পরিবেশ অত্যন্ত রুক্ষ এবং কঠোর। পাহাড়, জঙ্গল, বৃষ্টির অপ্রতুলতা, হিংস্র জানোয়ারের পাশাপাশি বাস থাকা সত্ত্বেও এখানকার অধিবাসীরা বাধ্য হয়েছে এই পরিবেশে থাকতে। বলা বাহুল্য এটা এরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত শক্তিশালীগোষ্ঠীর অত্যাচারে, শোষণে এরা এই প্রতিকূল পরিবেশ গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

উন্নত সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ঝাড়গ্রাম মহকুমার মানুষ নিজেদের বেদনাময় দিন যাপন এবং প্রাণধারণের গ্লানি ভুলে থাকার জন্য পরব, পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান নৃত্য-গীত এবং সঙ্গীতের মধ্যে সর্বদাই নিজেদের নিমজ্জিত করে রাখার চেষ্টা করেন। এই কারণেই এখানকার লোক-সংস্কৃতি এত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময়। বলা যেতে পারে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ সাধনের একটা বিরাট গণমাধ্যম।

লোকসংস্কৃতি ও জনসংযোগ ঃ

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের বসবাস অত্যন্ত অল্প। মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের বেশী কুর্মী, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাগাল, দেশোয়ালী, কোড়া, ডোম, মাহালী, লোধা, কামার, প্রভৃতি। সাঁওতাল বাদে সকলেরই কথ্যভাষা ঝাড়খণ্ডী বাংলা। তবে সাঁওতালরাও যখন অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন তারাও ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

১লা মাঘকে এখানকার মানুষ তাদের কৃষি ক্যালেণ্ডারে বছরের প্রথম মাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। "হালচার" নামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিবর্ষের সূত্রপাত। স্থানীয় ভাষায় এই দিনকে বলে "আখ্যান-

যাত্রা"। তখন থেকে সারা বছর পর্যায়ক্রমে ভগতা, গরাম, করম, জাওআ, ইঁদ, মনসা পূজা, জিতুয়া কাঠি নাচ, বাঁধনা পরব এবং টুসু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলি থেকে এখনো অনেক দূরে। যাত্রা, থিয়েটার সিনেমা, নাটক, খবরের কাগজ, টেলিভিশন এদের আয়ত্তের বাইরে। রেডিও যদিও অধিকাংশ গ্রামে পোঁচেছে কিন্তু রেডিওর বর্তমান অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে সাঁওতালী অনুষ্ঠান (সাঁওতালদের নিকট) এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে লোকসঙ্গীত কিছুটা উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। তবে রেডিও থেকে প্রচারিত লোকসঙ্গীতগুলির সুর কথা সম্পর্কে ক্রমশঃ ঝাড়গ্রাম মহকুমার লোকসঙ্গীতের ধারক বাহক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ ক্ষোভ দানা বাঁধছে।

তাই জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে এখানকার লোকসংস্কৃতিই আবহমান কাল যাবৎ এক লৌকিক গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। টুসু, ঝুমুর, পাঁতা, ছো প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে এখানকার মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা-বেদনার কথা আবহমান কাল যাবৎ প্রকাশ করে আসছে।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার বসবাসকারী আদিবাসী এবং মূলবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এত বড় গণ-মাধ্যম আর কিছুই নেই। এখানকার মানুষ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে এরা আবহমান কাল যাবৎ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত শক্তি এখানকার মানুষকে বিভিন্ন ভাবে শোষণ করেছে। সেই সঙ্গে এঁরাও কিন্তু থেমে নেই, নিজেদের সৃষ্ট লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত, মেলা, পূজা-পার্বণকে মাধ্যম করে এরা আবহমানকাল সংগঠিত হয়ে এসেছে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে আন্দোলন করে আসছে।

কোন প্রচার ছাড়াই এখানকার প্রতিটি মেলা উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে। যা পরম্পর পরম্পারের মধ্যে একটা সেতু বন্ধনের কাজ করে আসছে।

পাঠান, মোগল, ইংরেজ, এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এখানকার মানুষ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করে আসছে। তাই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দেখা গেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার লোকসংস্কৃতিই এখানকার সবথেকে শক্তিশালী জনসংযোগের গণমাধ্যম।

উৎস পরিচয় ঃ

ঝাড়গ্রাম এলাকার লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস পুরাতাত্বিক নিদর্শন, প্রভৃতির আলোচনা করলে দেখা যাবে এই এলাকার আদিবাসীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। এখানকার আদিম জনগোষ্ঠীর যৌথ নৃত্য মূলতঃ ম্যাজিকের আচার অনুষ্ঠান ও যৌথ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। তাই নাচের শৈলী ও ভঙ্গী, লোকসঙ্গীতের বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গীর মত পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলার স্টাইল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে কোন বিশেষ ঘরানা বা কোন বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি যিনি গুরু নামে পরিচিত।

কিন্তু এখানকার লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্যের গুরু হিসেবে একক-ভাবে কেউ দাবী করতে পারেন না। এখানকার মানুষ, প্রকৃতি-সাংস্কৃতিক সূত্র সকলে মিলে সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ লোকনৃত্যের ও সঙ্গীত-শৈলির জন্ম দিয়েছে তিল তিল করে, যা একান্তভাবে ঝাড়খণ্ডী মূলবাসী মানুষ তথা আদিবাসীদের এক মহৎ এবং অসাধারণ সামগ্রিক গোষ্ঠী প্রচেষ্টা। এই সামগ্রিকতা সমতল বিহার উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে অনুপস্থিত।

"সহজ ও সরল উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয় মূলতঃ লৌকিক পরম্পরার মাধ্যমে যাঁরা বাঁচার জন্য ধান

উৎপাদন করেন, তাঁরা মনের তথা সামগ্রিক সত্তার জন্য গানেরও জন্ম দেন। তাই তাদের মুখনিঃসৃত ছন্দোবদ্ধ কথাগুলিই স্থানীয় বিভিন্ন লৌকিক সুরের মাধ্যমে লোকসঙ্গীতে পরিণত হয়।"

"লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য, প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষে মানুষে লেনদেন, মানুষ ও দেবদেবীর সম্পর্ক যা মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক ফসল ও গোষ্ঠীচিন্তার নির্যাস।"

(ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন—পশুপতি প্রসাদ মাহাত)

লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ধর্ম হল গতিশীলতা। প্রাণের আবেগে লোক-কবিদের সৃষ্ট এই সাহিত্য, তা লোকসঙ্গীতই কিম্বা ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, লোককথাই হোক দেশকালের সীমা অতিক্রম করে মানুষের স্মৃতির প্রবাহে বাহিত হয়ে তার নিজের গতিতেই অতীত ও বর্তমানের সংস্কাব সাধনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলে।

"এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের ভাষার মধ্যে গতিশীলতা বা অগ্রগমনের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। আচারধর্মী গানের ভাষা বা মন্ত্রের ভাষা বিশেষ কারণে যা পরিবর্তন হয় না। সেই সমস্ত মন্ত্রের ভাষা বা আচারধর্মী গানের ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সংপৃক্ত গানের ভাষা তুলনায় অনেক বেশী অগ্রবর্তী-সমসাময়িক। লোকসংস্কৃতির এই যে বিবর্তন তা সর্বকালে লোকচক্ষুর অন্তরালে এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, কোন কালেই এ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা থাকে না।"

ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ঝাড়গ্রামেও পাঁতানাচ, করমনাচ, ছো-নাচ, জাওআ নাচ, সবই কৃষিকর্মভিত্তিক। ছো-নাচ প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ বলে তা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাঁতানাচ স্ত্রী-পুরুষদের যৌথ নৃত্য, জাওআ স্ত্রীনৃত্য। ঝাড়গ্রাম এলাকার মাহাত, বাগাল, দেশোয়ালী, ভূমিজ, মুণ্ডা, ডোম, মাহালী, কামার প্রভৃতি সমস্ত গোষ্ঠীই এই নৃত্যগীত সমূহের ধারক ও বাহক, ফলে যুগের পর যুগ এরা সহাবস্থান করে আসছে এখানকার লোকসংস্কৃতিকে মাধ্যম করেই।

ট্রাইব অর্থ নৈতিক অবস্থা থেকে কৃষক সম্প্রদায় হিসেবে মানুষের যে বিবর্তন প্রকৃতি ও জমিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীচিন্তার ফলে তাঁরা নিজস্ব লৌকিক পরম্পরার জন্ম দেন। এই লৌকিক পরম্পরা ভুপ্রাকৃতিক অবস্থান ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অভিব্যক্তি, যার ফলে লোকসঙ্গীতের সহজ ও সরল সুরের মধ্যে একটি বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী (Tonal quality) লৌকিক নৃত্যছন্দ বা শৈলী (Dance quality) ও বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

বিবর্তন ঃ

ঝাড়গ্রামের সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলির বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক শক্তির প্রভাব এই এলাকাতে প্রবাহিত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বিজ Twice born) মনোভাব, সংস্কৃতকরণ (Sanskriti-sation পদ্ধতির উপর গবেষণা করেছেন, শরৎচন্দ্র বসু নির্মলকুমার বসু সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ ডঃ কে. এস. সিং, পশুপতিপ্রসাদ মাহাত প্রমুখ।

সকলেই হিন্দু মেথড অথ ট্রাইবাল অ্যাবজোর্পসন প্রক্রিয়ার সূত্রটি ধরে আদিবাসীরা কিভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুতে পরিণত হবার চেষ্টা করেছেন, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্যায়ন করেছেন। "ডঃ সুরেশ সিং, ডঃ সুরজিৎ সিনহা লক্ষ্য করেছেন মধ্যভারতে ভুমিজ ও চেরো রাজা ও রাজত্ব গঠন হবার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে মুণ্ডা-মানকি-ঘাটোয়াল ও রাজা সম্পর্কের জন্ম দিয়েছিল এবং ভুমিজ সর্দার ও জমিদাররা কিভাবে সাধারণ ভুমিজ প্রজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।"

(ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, পশুপতিপ্রসাদ মাহাত)

নৃতাত্ত্বিক পশুপতিপ্রসাদ মাহাত আদিবাসীদের হিন্দু হবার বাসনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন, জোর করে এখানকার আদিবাসীদের উপর হিন্দুত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। "মুসলীম লীগের ১৯৪০ সালের পাকিস্থান প্রস্তাবের পর ১৯৪১ সালে নৃবিজ্ঞানী ও গান্ধীজির ব্যক্তিগত

সচিব নির্মলকুমার বসু Hindu mode of Tribal absorption প্রবন্ধটি লেখেন।

"অবশ্য শ্রীবসু বলেন নি যে, আদিবাসীরা হিন্দুদের জাতিবর্ণ মডেলের কোন স্থানে নিজেদের অবস্থান করাবে। তাই সামন্ত ও বড় চাষীদের মধ্যে বাংলা প্রদেশের সর্বত্র ক্ষত্রিয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভূমিজ, কুর্মী, ভুঞা, মুণ্ডাদের রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন গল্পের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই রাজবংশী, কোচ, মাহিষ্য, নমশূদ্র, কুর্মী, মাহাত ভূমিজদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় মিথ (সংস্কৃত শ্লোক সহ) সরবরাহ করেছিলেন।"

(শিলালিপি, ২য় সংখ্যা জামসেদপুর, পি. পি. মাহাত)

"আচার সর্বস্ব যৌথ নৃত্যশৈলী ডাঁইড় নাচ বা পাঁতা নাচ, লটুয়া নাচ, জাওয়া নাচ, মাঝি নাচ (সাঁওতালদের নাচ), নাচনী নাচ, ভাদুরিয়া ঝুমুর ও কীর্তনের সুর ও তালের সমন্বয়ে দরবারী ঝুমুরকে কেন্দ্র করে যে লাস্য নৃত্য ও গাজন নাচ দরবারী ঝুমুর ও ভাদরিআ রঙ-এর সহযোগে এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড লৌকিক নৃত্যকলার সংমিশ্রণে একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যশৈলীর জন্ম দিয়েছিল, তাকে মূলতঃ স্থানীয় অধিবাসীরা ছো নাচ বলেন। স্থানীয় রাজা মহারাজারা তাঁদের সভাকবি নৃত্যশিল্পীদের মাধ্যমে লৌকিক সুর-মাধুর্যের আশ্রয়ে ও কীর্তন তালের সমন্বয়ে যে দরবার সংস্কৃতি থেকে দরবারী ঝুমুরের সৃষ্টি দরবারী ঝুমুরগুলি তাই ভণিতাযুক্ত।"

(ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, পি. পি. মাহাত)

রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক নৃত্যশৈলীগুলির গ্রহণ-যোগ্য তাল ও সুর মিলিয়ে জনসাধারণের আনন্দের জন্য উপরোক্ত ছয়টি লৌকিক নাচের সমন্বয়ে ঢোল-ধমসা ও সাহনাই সহযোগে পূর্ণাঙ্গ নাচের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। স্থানীয় ভাষায় তাই মনে হয় এর নাম ছো-নাচ।

এক সময় এই ছো-নাচ মূলতঃ পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর কিংবা কোন শিকারের কাহিনী নির্ভরই ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ ছো-নাচের মধ্যে সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক বিষয়ক পালারও সংযোজন ঘটছে। বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও হারমনিয়াম, কর্ণাট, ফ্লুট প্রভৃতির সংযোজন ঘটেছে। তবে ছো-নাচের ঐতিহ্য ঠিকই আছে, বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। অবশ্য ঝাড়গ্রাম এলাকায় লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই।

বর্তমান প্রবন্ধকারের "ঝাড়খণ্ডের লোকসঙ্গীতে গণচেতনা" শীর্ষক প্রবন্ধে সে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে চুয়াড় বিদ্রোহ থেকে জরুরী অবস্থা পর্যন্ত প্রতিটি সময়েই এখানকার লোক-শিল্পীরা সরকারী অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এই লোকসঙ্গীতের মাধ্যমেই। আমি এখানে দু-একটা লোকসঙ্গীত উল্লেখ করে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করছি—

দু একটা গুড়া লাগাই (রোপন করে) মাইষর পৌষে
বছর দিনটা কাটে কিসে উপায় নাইছে ধারে পাসে
রিলিপ সড়প খুলল যদি কাজ করি মেলে মেশে
ই বছর ভাই সবাই গরীব কাজ হইল মোটে দিন দশে।
সড়প খাঁটে এক টাকা গম দিল তুঁষে ভুঁষে
এক বেলা ভাই গহম ঘাঁটা এক বেলা খাই ময়দা থাঁসে।
ই বছরের আকালে গহম পিঠা সকালে
বল বল বঁধু কে লুকালে আঁচলে।

ভেড়া ছাগল বিকেঁ খালি, আর খালি মোরগ হাঁসে
ঘটি বাটি পড়ল বাঁধা এবার মরি গাছে ঘেঁষে।

এ বছর উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে দু-একটা ক্ষেতে মাত্র চাষ হয়েছে। তাতে যে ফসল পাওয়া গেছে তা পৌষ মাসের মধ্যে ফুরিয়ে গেছে।

ধারে পাশে বছর চালাবার মত কোন উপায় দেখছি না। ত্রাণ ব্যবস্থা হিসেবে সরকার রাস্তা তৈরীর কাজ দিয়েছেন। দিনমজুর এবং গৃহস্থ সবাই সেখানে মিলে মিশে কাজ করি। এ বছর চাষের কাজ হয়েছে মাত্র দিন দশ। তাই ক্ষেতমজুর কাজ পায়নি, আর কৃষক ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। ফলে এ বছর সবাই গরীব। তুঁষ ভুষি মেশানো গম এবং এক টাকা পাই। তাতে এক বেলা গম সেদ্ধ আর এক বেলা আটার রুটি। তাও কুলোয় না। পেটের দায়ে ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী সব বিক্রী হয়ে গেছে। ঘটি বাটি বাঁধা পড়েছে, এবার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

ঝাড়গ্রাম এলাকার মূলবাসীদের মধ্যে সম্পন্ন চাষী কিংবা জোতদার প্রায় নেই বললেই চলে। সবাই প্রায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর চাষী। যাদের এখনো কিছু জমি আছে তারা নিজেরাই পরিশ্রম করে নিজের জমিতে ফসল ফলায় আর যাদের জমি নেই তারা পরের জমিতে ক্ষেতমজুরী করে। তাই বলে এখানে শোষক জোতদারের অভাব নেই। কিন্তু এই জোতদার-দের প্রায় সবাই বহিরাগত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত ধরে এখানে এদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কালক্রমে সুদের কারবারে এবং কোম্পানীর জটিল আইনের সহায়তায় এখানকার আদিবাসীদের জমিজমা এঁরা নিলামেব মাধ্যমে হস্তগত করে জমিদার হয়ে বসে। যারা একদিন জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করেছিল আর সেই জমিতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও পুরুষানুক্রমে চাষবাস করে আসছিল, জমির অধিকার হারিয়ে তারা এই সুদখোর বনিয়া মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কেউ বা আসামে, উত্তরবঙ্গে চায়ের বাগানে পালিয়ে যায়। আর যারা তখনো যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেইটুকু সম্বল করে জন্মভূমিতেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাদের দূর্দশার আর অন্ত থাকে না। অভাবের তাড়নায় মহাজনের কাছে আবার হাত পাততে হয়। যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্য আসক্ত হয় মদের নেশায়। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত কিছু বাঁধা পড়ে শুঁড়ির সিন্দুকে। কিন্তু মহাজন, সে তো ছাড়বার পাত্র নয়। যমদূতের মত লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে

থাকে কৃষকের সামনে। আইন তার সহায়। কৃষকের এই অসহায় অবস্থার কাতর দীর্ঘশ্বাস বাস্তব হয়ে উঠেছে নীচের গানটিতে—

যাউ ছিল গুঁড়িগাড়ি
ভাঁড়্যে লিল লখ্যা শুঁড়ি
আইড়ে বস্তে ঝুরত নয়ান
মহাজনকে কি দিব জবান।

জমির অধিকার হারিয়ে সহায়-সম্বলহীন কৃষক আসামে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারও বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে পাঁতানাচের গানে।

সাহেব দিল কদালেরই কাম
টিপিকি টিপিকি পড়ে ঘাম
হে বাঁকা শ্যাম ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম।

বাঁকা শ্যাম এখানে প্রেমিক। ভাগ্য বিপর্যয়ে সে প্রেমিকাকে সঙ্গে না নিয়েই চলে গেছে আসামের চা বাগানে নতুন ভাগ্যের সন্ধানে। এ ছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আন্দোলন ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নীল বিদ্রোহের কাহিনী, বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা সমস্ত আমরা দেখতে পাই সমকালীন লোকসঙ্গীতগুলিতে। এই সমস্ত গান ভণিতাহীন, কারণ লোককবির নাম যুক্ত থাকলে অনেক সময় তা প্রশাসনের দিক থেকে বিপদ ডেকে আনতো, তাই সমস্ত লোকশিল্পী তা এড়িয়ে যেতেন।

এখন দেখা যাক ঝাড়গ্রামের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির কোন্ শ্রেণী দীর্ঘদিন যাবৎ এখানকার প্রচলিত লোকমাধ্যমগুলি ব্যবহার করে সরকারী অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। বিভিন্ন গেজেট থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৩১ পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার জনজাতি সমূহের একটা বিরাট অংশ আদিবাসী তালিকাভুক্ত হিসেবে ছিল। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বেশ কিছু জাতিগোষ্ঠী আদিবাসী সুচী থেকে বাদ যায়, অবশ্য এই বাদ যাবার কারণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার চাপে তথা-

কথিত কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতা জোর করে এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর উপর হিন্দুত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন। আবার কারো কারো মতে এই সমস্ত জনজাতিসমূহের মধ্যে যারা গ্রামের মোড়ল (Headman) তাঁরা তখন সামাজিক মর্যাদা পাবার আশায় হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েন। পৈতা ব্যবহার করে ক্ষত্রিয়ত্ব ধারণ করেন, মুরগী পোষা বন্ধ করেন।

ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃতি পাবার পর এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠী তখন নিজেদের গোষ্ঠীর গরীব শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "বাবু মানসিকতার" মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে শুরু করেন, ফলে একই জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিতে শুরু করে।

ফলে এই বাবু-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষগুলি ক্রমশঃ নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন। তাঁরা আধুনিক বাংলা নাটক, যাত্রা, সিনেমার প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। বর্তমান প্রতিবেদক ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অন্ততঃ কয়েক শত গ্রাম ঘুরে দেখেছেন যে এই সমস্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও দুটো শ্রেণী আছে।

(এক) যাঁরা গ্রামের তথাকথিত উচ্চবিত্ত (যে কোন বর্ণের কিংবা ধর্মের) তাঁরা লোকসংস্কৃতি চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। এঁরা আজ বেতার, দূরদর্শন, যাত্রা, সিনেমার প্রতি অত্যন্ত আস্থাভাজন। লোক-সংস্কৃতি চর্চাকে এঁরা ছোট কাজ মনে করেন। সংখ্যায় কিন্তু এঁরা নগন্য।

(দুই) যাঁরা গ্রামের সাধারণ মানুষ (যে কোন বর্ণের কিংবা ধর্মের) তাঁরা আজও ঝাড়গ্রামের আপন সংস্কৃতি চর্চায় মেতে আছেন। এটা এঁদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় গণমাধ্যম।

আমরা কোলকাতার সি. সি. সি. এ. নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে একটা সমীক্ষা করে দেখেছি যে, ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের শতকরা ৯০ জনেরও বেশী আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলির প্রতি তেমন কোন আস্থা রাখেন না।

বেতারেও সাঁওতালী অনুষ্ঠান এবং কিছু কিছু লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান মাত্র এরা কোন কোন সময় শোনেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির প্রতি এদের আস্থা অত্যন্ত কম। সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলির প্রতি ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাধারণ মানুষের তাই ক্রমশঃ বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের এই এলাকার লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে চরম অবহেলা ফলে যতই দিন যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষদের (যারা লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত) মধ্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিচ্ছে। ইদানীংকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই সুযোগ গ্রহণ করে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তথাকথিত বিচ্ছিন্ন মানসিকতার সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তাঁরা ঝাড়গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী মূলবাসী মানুষকে সরকারী ঔদাসীন্যের কথা বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন। ফলে আলাদা রাজ্যের দাবী ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার লোকশিল্প এবং শিল্পীদের বিকাশ লাভের জন্য এখনো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। বেতার, দূরদর্শন লোকরঞ্জন শাখা প্রভৃতি সব বিভাগই এ বিষয়ে নির্লিপ্ত। সেই সঙ্গে ভাষাগত সমস্যাও যুক্ত। এখানকার মূলবাসী ও সাঁওতালদের কথ ভাষা মূলতঃ কুর্মালী ও সাঁওতালী, কিন্তু এ নিয়েও সরকারের তেমন কোন মাথাব্যথা নেই, ফলে ভাষাগত সমস্যার জন্য এই গোষ্ঠীগুলি ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

সম্ভাবনাময় গণমাধ্যম

যে কোন সমাজের লোকসংস্কৃতি সেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সেই সমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি, রেওয়াজ, উৎসব, অনুষ্ঠান, জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, ভালবাসা, যৌনতা, খাদ্য, পানীয়, বিধি, নিষেধ ইত্যাদি সব কিছুই সগৌরবে স্থান লাভ করে থাকে।

এই লোকসংস্কৃতির বড় ধর্মই হোল সজীবতা, সচলতা। প্রচণ্ড প্রাণ বেগে তা বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিপথ বেয়ে লোক মুখে দেশকাল পাত্র

তিয়াত্তর

ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে আপন অন্তরের গতিবেগেই তা পরিবর্তিত হতে থাকে লিখিত আদর্শরূপ থাকলেও সাধারণ মানুষ তা মিলিয়ে দেখে সংশোধন করে না বরং বলা চলে তার প্রয়োজনই বোধ করে না। তবে লিখিত বা অলিখিত যে কোন লোকসাহিত্যই হোক না কেন তার একটা গতি ও কথ্য রূপ আছে। তার জন্য শ্রোতা যেমন দরকার তেমনি তার আসল পরিবেশ, সুর, বাচনভঙ্গী ইত্যাদিরও প্রয়োজন। এর অভাব ঘটলেই লোকসংস্কৃতির আসল রস থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন, যেখানে এখনো আধুনিক সভ্যতার প্রয়োগ হয়নি অথবা যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটেছে কিন্তু পটভূমি বিশ্লেষণ না করে প্রয়োগ করার ফলে তা ব্যর্থ হচ্ছে। আসলে আধুনিক সভ্যতার নামে আমরা যে মাধ্যমগুলি জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি সেগুলি একমুখী, যেমন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। তাছাড়া এখনো ভারতবর্ষের শতকরা ৬৭ ভাগ জনসাধারণ অশিক্ষিত, তাই উপরোক্ত মাধ্যমগুলি জনসংযোগের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। তাই, সমীক্ষা করে দেখা গেছে গ্রামে বসবাসকারী ৮০ ভাগ জনসাধারণ আবহমান কাল যে গণমাধ্যম ব্যবহার করে আসছে তা লোকমাধ্যম। আগেই বলেছি, লোক-সংস্কৃতিতে সমাজজীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়ে আসছে। অবশ্য এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, তা হোল, মিঃ হ্যারিসন বলেছেন অসভ্য আদিবাসী রৌদ্র বাতাস বা বৃষ্টির প্রয়োজনে মন্দিরে গিয়ে কৃত্রিম দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না। বরং সে তার গোষ্ঠীর লোকদের ডেকে সমবেতভাবে প্রয়োজন মতো রৌদ্র নৃত্য কিম্বা ঝটিক নৃত্য অথবা বর্ষা নৃত্যের আয়োজন করে। এখানেই লোকনৃত্য বা সঙ্গীতের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

যে কোন পদ্ধতির নিখুঁত ঐন্দ্রজালিক অনুকৃতির সাহায্যে বাঞ্ছিত

ফললাভ করা সম্ভব। কালবৈশাখীর রূপ এবং গতি ভঙ্গিমার ঐন্দ্র-জালিক অনুকৃতি ছো-নাচের উদ্দেশ্য বৃষ্টি লাভ। পরবর্তীকালে অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রশাসকরা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করেছে, ফলে সাধারণ মানুষের নিকট তা নিছক মনোরঞ্জনেরই একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আজ যেখানে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাচ্ছে তখন প্রশ্ন উঠেছে জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যম কীভাবে ব্যবহার করে বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকায় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই বর্তমান পটভূমিকায় লোকমাধ্যমই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গণমাধ্যম বলে আমাদের বিশ্বাস, কারণ আগেই বলেছি ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ যাঁরা গ্রামে বসবাস করেন তাঁরা সকলেই এই মাধ্যমের ধারক ও বাহক, তাই বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লোকমাধ্যমকে জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অবিলম্বেই এটি একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পরীক্ষামূলকভাবে বর্তমান প্রতিবেদক দুর্গম পার্বত্যময় জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় যেখানে দিবারাত্র প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজস করে এক শ্রেণীর চোরাচালানকারী সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ করছেন, সেখানকার একটি ছো-নাচের দল এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ছো-নাচের মধ্যে প্রকাশ করার পরই ঐ এলাকায় একটা রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এবং ঐ সমস্ত চোরা-চালানকারীগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ ঘটনার পর এলাকার বিভিন্ন ছো-নাচের দল তাদের এলাকার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে এবার ছো-নাচে রূপ দিতে আরম্ভ করেছেন, ফলে এলাকার এই প্রয়াস একটা আন্দোলনে রূপ নিতে আরম্ভ করেছে।

ছো শিল্পীদের ওয়ার্কশপ — গোবিন্দপুর

ছো-নৃত্যে সমসাময়িক জীবন ঃ ছো-নৃত্য উৎসব, নবীনডি

প্রচলিত ছো-নৃ

মাছানি—একটি শক্তিশালী লোকনাট্য

নাছনি লোকনাট্যে একটি দৃশ্য
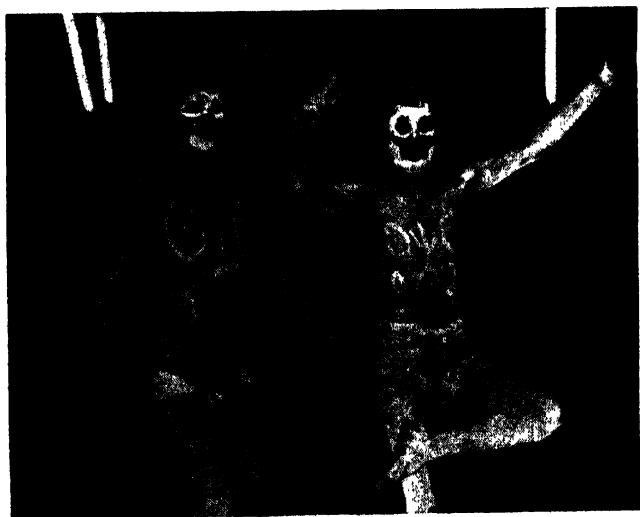
ঝুমুর-এর সঙ্গে নৃত্য : পুরুলিয়া

কিরীটি মাহাতো

ঝুমুর ঃ একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীতধারা

প্রস্তাবনা

পুরুলিয়া বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম সাবডিভিসন, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ কেঁওঝোর সুন্দরগড়, বিহারের সিংভূম, ধানবাদ, রাঁচি, হাজারী-বাগ, সাঁওতাল পরগণা, মধ্য প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় সঙ্গীত হলো ঝুমুর। অরণ্য প্রদেশ, জঙ্গল মহল, ঝাড়খণ্ড বা ছোট নাগপুরের মালভূমি এই অঞ্চলকে যাই বলা হোক না কেন ঝুমুর হলো এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দিগন্ত বিস্তারি লাল মাটি ও কঙ্করময় মালভূমি, শাল পলাশ মহুয়া, ধঅ, সিধা, কেঁদ, ভেলুয়া, অরণ্য ঢাকা পরেশনাথ, অযোদ্ধা, বাগমুণ্ডি, পাঁচেত, বাদাম পাহাড়, জারগাম, বেলা, জনা, সেঁওআতি, কিরিবুরু দলমা, শুশুনিয়া, সিমলিপাল, ডুংরাবুরু, ঝামরি, সাজবুরু, কঁচবুরু, জারগোবুড়ি, আমকা, গহিরা, তিলাবনি, বওআ ইত্যাদি অসংখ্য নাম-না-জানা ছোট ছোট পাহাড় ও ডুংরি, সবন্নখা, কাঁসাই, দামুদর কুমারী, হাড়াই, গুআই, রাঢ়ু, কাঁচু, খরখরি, অগুনতি ছোট বড় খরস্রোতা নদী, কুড়মী, ফোড়া, ওঁরাও, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা হো, খেড়িয়া, বাউরী, হাড়ি, রাজোয়াড় বিভিন্ন আদিম আরণ্যকগোষ্ঠীর বসবাস সহজেই ভৌগলিক ও ঐতিহাসিকভাবে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে এই অঞ্চলকে। নিজস্ব ভৌগলিক পরিবেশ ও আরণ্যক জীবনকে কেন্দ্র করে যে লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তারই শ্রেষ্ঠ অবদান হলো ঝুমুর সঙ্গীত। এক কথায় ঝুমুরকে এই অঞ্চলের প্রাণসঙ্গীত বলা যায়। এখানকার

জনজীবন তথা সমাজের নাচ, গান, আনন্দ, বেদনা, দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্ম, সামাজিক ও ধর্মীয় পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানে ঝুমুরের ব্যবহার দেখা যায়। তাই ঝুমুরের মধ্যেও এখানকার মানুষের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনার সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাই।

এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, জীবিকাগত বিভেদ থাকলেও ঝুমুরের ক্ষেত্রে কোন বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সুর ও ভাবের দিক থেকে মিল থাকায়, যে যে ভাষায় ঝুমুর গেয়ে থাকুক না কেন অপরের বুঝতে ও অংশগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। আসলে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলকে ভিত্তি করে প্রকৃতি, লোকায়ত জীবনের নির্যাস হলো লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের মধ্যে জনজীবনের ভাব ও ভাষা, সুর ও গীত হয়ে ধরা পড়ে। সুরের বৈচিত্র্য ও গতিবিধি তরঙ্গময় মালভূমি ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে কম সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়। স্থান ও জাতিগতভাবে সুরের পার্থক্য ঘটেনি তা নয়, তবে তা ঝুমুরকে বৈচিত্র্যপূর্ণ অলঙ্কারের মতই শোভিত করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতজগতকে সঙ্গীত বিশারদগণ দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত, দুই, দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত। মূল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঝুমুর-এর কোন একটি ধারায় না পড়লেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য সুর ও তালের বৈচিত্র্যে এবং কাব্য সম্পদে ঝুমুর অনণ্য, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার ঝুমুর যেন এই সংস্কৃতির বিভিন্ন নাচ গানের উৎসভূমি। ছো-নাচ, কাঠি নাচ, নটুআ নাচ, ডেহো নাচ, মাছানী, তথা এমন কোন নাচ গান নেই, যার উপর ঝুমুরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েনি। ইতিহাসের ধারার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সংমিশ্রণে ঝুমুরে লোকসঙ্গীত ও ধ্রুপদী সঙ্গীতের যে সমন্বয় ঘটেছে তা এক স্বতন্ত্র সঙ্গীত ধারার জন্ম দিয়েছে। ভাব, ভাষা ও সুরে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে

অক্ষুন্ন রাখার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের প্রবহমানতাকে স্বীকার করে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চলনও এতে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

এই চরিত্রের জন্য ঝুমুরে যেমন দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে তেমনি যে-কোন সঙ্গীতের সঙ্গেই ঝুমুর জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিয়ে যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সাহিত্য বিচারেও ঝুমুর এক বিশাল সাহিত্য-ভাণ্ডারস্বরূপ। তাই ঝুমুর কেবল একটি আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতই নয়, এক বিরাট স্বতন্ত্র সঙ্গীতধারা বলে আমি মনে করি। ঝুমুর গায় না, ঝুমুর জানে না এমন লোক এতদঞ্চলে পাওয়া মুশকিল। লোকসংস্কৃতি ও ঝুমুর গবেষক রাধাগোবিন্দ মাহাত তাই সার্থকভাবেই এই অঞ্চলের নামকরণ করেছেন ঝুমুর-দেশ বলে।

ঝুমুরের উৎস ও পটভূমি

ঝুমুরের সংজ্ঞা : এতদঞ্চলে ঝুমুর কথার কোন প্রচলিত সাধারণ সংজ্ঞা না থাকলেও একটি বিশেষ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই ঝুমুর কথার ব্যবহার হয়ে থাকে। তেমনি ঝুমুর নাচ বলতে ডাঁইড় নাচ বা করম নাচ বা পাঁতা নাচকেই বুঝে থাকে। বাংলা, হিন্দী ও ওড়িশার আভিধানিকগণ ঝুমুরের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন নাচনীর নূপুরের ঝুম ঝুম শব্দ থেকে ঝুমুর কথার উৎপত্তি, কেউ শৃঙ্গারভরা রাগিনী বলেছেন, কেউ বা একে ঝুমর বা ঝুমরী বলেছেন যার অর্থ রাগিনী।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীর করণ, ডঃ বঙ্কিম মাহাত, ধীরেন সাহা, গিরীশ মহান্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ ঝুমুরের উপরে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তবে ঝুমুরকে মূলতঃ তাঁরা প্রেমসঙ্গীত বলেই উল্লেখ করেছেন। ব্যাপক সংগ্রহ ব্যাতিরেকে ঝুমুরের উপর সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি-কোণ থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। আমার মতে উপরোক্ত প্রতিটি সংজ্ঞায় আংশিক অর্থ প্রকাশ করে। সঙ্গীত বলতে যেমন গীত, নৃত্য ও বাদ্যের সমন্বয়কে বোঝায়, যদিও আধুনিক সঙ্গীত নৃত্যের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে, তেমনি ঝুমুরে আদি অবস্থায় গীত, নৃত্য ও বাদ্যের

প্রয়োগ ছিল। আদিই বা বলি কেন, বর্তমানেও নাচনী নাচে এর যথার্থ প্রয়োগ দেখা যায়।

ঝুমুরের আদি উৎস ও পটভূমি সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষকগণ মোটামুটি এক মত পোষণ করেছেন। প্রচলিত লোকমত ও কিংবদন্তীর কথা বলতে গিয়ে গিরীশ মহান্ত মহোদয় বলেছেন, দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নাকি ঝুমুরের সুরে বাঁশি বাজিয়েছিলেন এবং রাধা ও সখিগণ মণ্ডলাকারে নৃত্য করেছিলেন। এ মত যে বৈষ্ণবীয় যুগের সৃষ্টি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি কোন একক ব্যক্তি বা ঘটনার দ্বারা সম্ভব নয়, গোষ্ঠী চেতনাই এর উৎসভূমি। যাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ ঝুমুর গবেষক-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ঝুমুরের আলোচনায় অগ্রসর হব। সাঙ্গীতিক বিচারে ঝুমুরকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ভাদরিআ বা ডাঁইড়শালা ঝুমুর ও দুই, দরবারী বা নাচনীশালা ঝুমুর। ভাদরিআ বা ডাঁইড়শালা ঝুমুর হলো ঝুমুরের আদি রূপ। ভাদ্র মাসে এই ঝুমুর গাওয়া হয় বলে একে ভাদরিআ ঝুমুর বলা হয়ে থাকতে পারে। এই ঝুমুরের সঙ্গে নৃত্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ নাচ ছিল নারী-পুরুষের যৌথ নৃত্য। একে ঝুমুর নাচ বলা হয় আবার ডাঁইড় বা পাঁতা হয়ে হাত ধরাধরি করে নাচা হয় বলে ডাঁইড় বা পাঁতা নাচও বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে নাচে মেয়েদের অংশগ্রহণ কমে গেলেও পুরুলিয়ার ঝালদা অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে, রাঁচি জেলায়, উড়িষ্যায় মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণে দেখা যায়। করম পরবে করম ডালকে বেষ্টন করে এই নাচের প্রথম সূত্রপাত হয় বলে একে আবার করম নাচও বলা হয়ে থাকে। নাচের দিক থেকে অর্থাৎ নৃত্য ভঙ্গিমা বা আঙ্গিকে করম বা জাওয়া নাচের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল দেখা যায়। গীতের ক্ষেত্রেও করম নাচের বহু গীত ঝুমুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নৃত্যশৈলীতে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের অঙ্গভঙ্গির সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি করমগীতই ঝুমুরের উৎসভূমি।

ঝুমুরের ক্রমবিকাশ

পূর্বেই বলেছি করম নাচ ও গীত থেকেই আদি ভাদুরিআ ঝুমুরের উৎপত্তি। পরবর্তীকালে ঝুমুরে ভাব, ভাষা, সুর, তাল আঙ্গিকে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং ঝুমুর এক বিরাট সঙ্গীত ধারা রূপে প্রতিভাত হয়। আদি ভাদরিআ ঝুমুর ও ঝুমুরের পরিণত রূপ দরবারী ঝুমুরের বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঝুমুরের এই ক্রমবিকাশ আমরা আলোচনা করব। সাঙ্গীতিক বিচারে ঝুমুরকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—১, ভাদরিআ ঝুমুর, ২. দরবারী ঝুমুর বা নাচনীশালা ঝুমুর। ভাদরিআ ও দরবারী উভয় ঝুমুরেই আবার বহু ভাগে বিভক্ত। এক এক প্রকার ঝুমুরের উপর আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মূলতঃ ভাদরিআ ঝুমুরকে ভিত্তি করেই দরবারী বা নাচনীশালিয়া ঝুমুরের উৎপত্তি ঘটেছে। ঝুমুরের আদি পর্বের দিকে অর্থাৎ দরবারী ঝুমুর সৃষ্টি হওয়ার ঠিক পূর্বে ভাদরিআ ঝুমুরে দরবারী ঝুমুরের একটা মাঝামাঝি রূপ দেখা যায়। এই অবস্থায় ভাদরিয়া ঝুমুরে আদি বা প্রথম দিকের ভাদরিআ ঝুমুরের থেকে ছোট বা হাল্কা বিষয়বস্তু থেকে কাহিনীর প্রয়োগ দেখা যায়। সুরের গতিবিধি বা চলনে দরবারী ঝুমুরের পূর্বাভাস বুঝতে পারা যায়। তবে তখনও ঝুমুরে ভণিতার প্রয়োগ হয়নি। ঝুমুরের আদি যুগটা একটা দীর্ঘ সময় ধরে অতিবাহিত হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। আদি যুগের শেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে পুরী গমন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী-দিগকে ভিল্লপ্রায় পরম পাষণ্ডরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়। যার সুস্পষ্ট প্রভাব আজও আমরা এই সমাজে দেখতে পাই।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকগণ তাদের ধর্ম প্রচারের কাজে এতদঞ্চলের উল্লেখ-যোগ্য লোকমাধ্যম ঝুমুরকে ব্যবহার করেন। ফলে ঝুমুরে যুগান্তরের

একাশি

সূচনা হয়। কীর্ত্তন, বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদী সঙ্গীত ও ভাদরিআ ঝুমুরের মিশ্রণে এক নূতন ধরণের ঝুমুর সৃষ্টি হয়। যা দরবারী বা নাচনী শালিয়া ঝুমুর নামে বিখ্যাত।

ঠিক এই সময় থেকেই এই অঞ্চলে আদিম আরণ্যক সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙ্গন শুরু হয়ে দেখা দেয় জমিদারী প্রথা। ফলে অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতা দেখা দেয়। সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা কাশিপুর, সিল্লী, বরাবাজার, ময়ূরভঞ্জ, সরাইকেলা, জয়পুর ও আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার, খেঁওটদার, মাহাতগণ এগিয়ে আসেন। ফলে দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় ঝুমুর এই যুগে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। ঠিক এই সময়েই একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঝুমুরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উড়িষ্যার ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহান্ত বলেন, এই সময় পুরীর মন্দিরে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদের ফলে দেবদাসী-গণ মন্দির থেকে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং যার পরিণতি স্বরূপ নাচনী নাচের উদ্ভব ঘটে। রাজা, জমিদার, সামন্ত রাজাগণ, মাহাতগণ নাচনীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ও অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও নাচনী রাখতেন। নাচনীদের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন। ফলে ঝুমুর ও নাচনী সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। ঢোল, ধামসা, চেড়পেটি, সাহনাই ও দরবারী ঝুমুরের মিলনে এক নূতন নৃত্যধারা নাচনী নাচ ও ঝুমুরে দরবারী ঝুমুরের উদ্ভব ঘটে। সম্ভবত দরবার থেকে সৃষ্টি বলে এই ঝুমুর দরবারী ঝুমুর বলে আখ্যাত হয়। বিভিন্ন পরব ও উৎসবকে উপলক্ষ্য করে দরবারে বসত নাচনী নাচ ও ঝুমুরের আসর। পরবর্তীকালে তা অপরিহার্য রীতিতে দাঁড়িয়ে যায়। এই যুগে বহু বিখ্যাত নাচনী রসিক, ঝুমুর কবি ও গায়ক রাজা, জমিদারগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

যুগের পরিবর্ত্তনে নাচনী নাচেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। নাচে ঢোল, ধামসার পরিবর্তে মাদল, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলার ব্যবহার দেখা দেয়। নাচনী নাচে নৃত্যশৈলীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী

গায়কীর ঢং বেশি করে প্রাধান্য পেতে থাকে। বৈষ্ণবী যুগে কীর্তনের প্রভাব বেশি দেখা গেলেও পরবর্তীকালে ঝুমুরে ধ্রুপদী চলন বৃদ্ধি পায়। নাচনী নাচে এই পরিবর্তন আনেন রসিক কলাকার চেপা মাহাত ও তাঁর নাচনী সিন্ধুবালা। পরবর্তীকালে বহু ওস্তাদ রসিক ও ঝুমুরিয়াগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বর্তমানেও এরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফলে ঝুমুর দেশে সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ফলে ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণ, আর্যীয় দেবদেবী, পৌরাণিক, রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা ও বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে। ঝুমুর কবিগণও নূতন ভাব ও বিষয়ের উপর অসাধারণ ঝুমুর সঙ্গীত রচনা করতে থাকেন। এ যুগে ঝুমুরে কাহিনী, রস ও অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। যার সমৃদ্ধি ও গুণগত মান যে কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অমূল্য রত্ন স্বরূপ। এই যুগ ঝুমুরের স্বর্ণযুগ। ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহান্ত একে কাব্যযুগ বলেছেন। রস ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ ঝুমুরগুলি এ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ভাদরিয়া ঝুমুর

পূর্বেই বলেছি ভাদরিয়া ঝুমুরই ঝুমুরের আদি রূপ। বিষয়ের সারল্যে ও বৈচিত্র্যে, সুরের চপলতায় ও ছন্দ মাধুর্যে ঝুমুরগুলি সত্যিই অনন্য। বিপুল সুরবৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্বের জন্য দরবারী ঝুমুরের চেয়ে এর জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। কেবল ডাঁইর নাচের ক্ষেত্রেই নয় নাচনী নাচের আসরেও এর প্রাধান্য দেখা যায়। আসর যখন ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে একটি ভাদরিআ ঝুমুরেই আসর জমাট করতে যথেষ্ট। বিষয় ও সুরের বৈচিত্র্য এর প্রধান আকর্ষণ। এখানকার সমাজ ও জীবনের সামগ্রিক ছবি যেভাবে এই ঝুমুরে ধরা পড়ে, দরবারী ঝুমুরে অনেক ক্ষেত্রেই তেমনটি দেখা যায় না। ভাদরিয়া ঝুমুরের সুরকে ভাদ্রমাসের প্রকৃতির অকৃত্রিম শস্য শ্যামল রূপের উজ্জ্বল আবেগ, ঢেউ খেলান শস্য ক্ষেত্রে বাতাসের ঢেউ, পাহাড়ী নদীর উজ্জ্বল ও উদ্দাম গতির সঙ্গে এর তুলনা

করা চলে। পাহাড়ী নদীর মতই এর সুর হঠাৎ উচ্চ স্বর গ্রাম থেকে শুরু হয়ে উচ্ছল গতিতে নীচে নেমে আসে, আবার নীচু থেকে উপরে উঠে যায়। ভাদরিআ ঝুমুরে ভণিতার প্রচলন দেখা যায় না। আসলে আদি ভাদরিআ ঝুমুরে ছিল পুরোপুরি সামাজিক মালিকানা। ভাদরিআ ঝুমুরকে সুরের বিভিন্নতা ও আঞ্চলিক ভেদে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন, ঝিঙাফুল্যা. ডহরওয়া গোলোয়ারী, মাঝিয়ালী, তামাড়িয়া, শিখরিয়া, বরহা ভূঞয়া, ডমকচ, খেমটা, মলহরিয়া, ভাটিয়ারী, মুদিয়ালি, উদাসিয়া, রসরসিয়া, রসপখিয়া পাহাড়কল্যা, ঝুমকা, ঝুমটা, নাগপুরিয়া, পতরভুল্যা, নিকান, আড়খেমটা চালখেমটা, রিঁঝামাঠা, পাটিয়ামেধা. বুরুটাঁইড়, ছোয়াড়ী, বুরুতামাড়িয়া ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন ধরণের ভাদরিআ ঝুমুরের উদাহরণ দিতে পারি। ভাব, ভাষা, গঠন, ছন্দ প্রকরণ, বিষয়, বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ—

ঝিঙাফুল্যা

১। ঝিঙাফুল তলি তলি
সাঁঝেক বেরা জাব তহরাক কুলহি।

২। ঝিঙাফুল মনে রাখিহা
পানি আনেক বেরা ডাকিহা।

৩। ঝিঙা ফুলে রঙ লেই নাই কেনে
বর হইলে বিঁধেছে চইখের কুনে।

৪। কাড়া লিলি হুচুকে ভাভে মরি পেছুকে
বাগাল রাখব সেত বাবুর বেটা ফুচুকে।

মুদ্যালি

৫। লদী ধারে গাছ পালহা কাঁদে
দেখ লদী ডুবাঞে রাখিবে কত জলে।

৬। লদী ধারে চাষ বঁধু মিছাই কর আশ হে
হবকি ডবকি লদী বহে বার মাস হে।

৭। হরদ রাঙল ধতিআ কমরে গঁজল বাঁসিআ
মনে পড়ে হদকি উঠই ছতিআ।

৮। বাগা লারে বাগা'ল। তর গট কত ধুরে রে
মার নুনি বলে দিবি ঘরে
গঠ হামার লদী পারে।

৯। লদী ধারিঞ তিলেক চাস, চঁটএরি খঁধা
খনেক উড়ে খনেক বসে পর পুরুসেক আসা রে
মন বাঁধব কেসে
পিআ গেল বিদেসেঁ রে।

ডহরোয়া

১০। পানি পাথরের পরব দেখবি কখন
বেলা গেল গ মাথা বাঁধবি কখন

মাঝিয়ালি

১১। হরদ রাঙল জবা ফুল, মাথার উপর গুঁজা
কিনে দেরে কামানা রঁাধব না, বাঁটব না, বাঁধব না মাথা।
যদি যাবি মাঠে, কিনে দিবি হাঠে
ভাভলার ফুল না হলে আমড়া মকুল।

গোলোয়ারী

১২। ইঁচলা মাছে বুঢ়া ঝিঙাই মেশল নাই
হেঁগ শ্বশুর গাইল দিয় না
আর এমন করব নাই।

১৩। রাজা কেরি আখড়াঞ করম গাড়াই
এহো আজা চালা হো করমা খেলে জাব।

১৪। ফুঁক দিতে মুহ পুড়ে গেল গনঠার আগুনে
কানা বাগনে—
দাগা দিল মাঘ ফাগুনে।

১৫। টিকটিকি দেখে ভাঁসুর পালা'ল
খঁচের মহুল খঁচেই সুখ্যা'ল।

১৬। ধান খালে কান লেবো, গুঁদলি খালে ছুঁদরি লেবো
রমহা খালে, জমা লাগতো গে সজনী।

১৭। বেরিআহ ডুবি গেল, কাঁধে মাদরি লেল
ঝুমরি বানা রে পিআ গেল গে ছুতি।

১৮। বাড়ী নামই চিটা মাটি ননদ পড়েছে
তিতা কাল্লা, কাল্লারে আলুরে ঝালুরে ধরেছে।

১৯। আষাঢ় শ্ররাবণ মাসে, মাড়ভাতটা কসে ক'সে
ভাদর মাসে বুঢ়ার পেট গেল বসে।

২০। ভাদর আসিন মাস, বড়িরে টানেক দিন
খজলে নাহি মিলে ঋণ,
কৈসে ধনি কাটবে দিন।

২১। মৌহা ত মুহাই দেল
ছোআটা না ধরি দেল
মৌহা ভুজইতে খাপর ফুটি গেল
মুহজারাই পুঁঠাই পিটি দেল।

২২। জখন জনহার কড় খাই, তখন শিয়াল মচড় খাই
ভাদর মাসে—
গাজাড়ে গাজাড়ে শিয়াল আসে।

২৩। জনহার ফুটে ফাট ফুট গার বিটি কুঁড়া ফুট
খড়র খস্যা জামাই আইল্য লিতে গ—
ভাদর মাসে।

২৪। জখন মড়ুআই দানা ভেল
ছোওআ পুতা কানা ভেল
জখন মড়ুআই রটি ভেল
ছোওআ পুতাক ভঁটি ভেল
ভালা রে মড়ুআ তরি বেড়ি গুণ। (কুড়মালি)

২৫। গেল ছিলি সড়বা'ড়্যা, নিয়ে আলি গুজু আঁইড়া
দেখ দাদা, গুজু আঁইড়ার মার
খেতের মাটি উঠাঞ দিল টাঁইড়।

২৬। রাইত পড়া মহুল হথ্য
লকে কুড়াঞ নিয়ে যাইথ
খঁচের মহুল পাড়ে রসে রসে
খাল ভরাই জনম সাঁথাছে।

২৭। রাস্তাঞ রাসতাঞ চলি জাব
জঁাহা পানি তাঁহা খাব
মঞ ত গাঁও জাব
বিহানে জনহা'র কুটি দিহা। (কুড়মালি)

২৮। বিহালা পুরুষ হ'থ, আগুই আগুই নিয়ে যাথ্য
সাঁখাল্যা পুরুষের মুহে ছাই
পেছুই পেছুই লুঝুক লুঝুক যাই।

২৯। কন ফুলা ধঁপা ধঁপা কন ফুলা লাল
সবরি গে, কন ফুলে ঝবরল ডাইর।
জুহি ফুলা ধঁপা ধঁপা, জবা ফুলা লাল
সবরি গে বেলি ফুলে ঝবরলি ডাইর॥ (কুড়মালি)

৩০। ডুঙরিকা ধারে ধারে বুনলি মঞ ধান
দাদারে, ভইআ রে—
সভে ধানা খাই গেলা মেজুরা রে।
হাঁক পাড়া দেওরা—
ধানা কিনারে সুগা নাম গেলা। (কুড়মালি)

৩১। ভাদর মাসে গাদর জনহার কাওয়াকে খাওয়ালি লো
হাঁসে হাঁসে অ তুঞ দেওরকে ভুলালি লো। (ঝিঙাফুল্যা)

৩২। হাঁটু ধরে বসবি, চাটু ধইরে বাঁটবি
টুএক খাবি, টুএক জগাঞ রাখবি
ছেল্যা কাঁদা মনে রাখবি।

৩৩। কুলহির মুড়াই টানাটানি
ছাড় লহা দিব হামি
খাল ভরার এত মনে ছিল
ভত্তি উমেরে দাগা দিল।

৩৪। এক পুয়া চাল দিব
মাড় ভাতটা বুঝাঞ লিব
পেট না ভরিলে গাইল দিব
কাইল হতে রাঁধনি ছাড়াব।

৩৫। আগুই আগুই রেল গাড়ী, তাকর পেছু মাল গাড়ী
তাকর পেছু জড়া পেসেঞ্জোর, কলকাতা কেইসন সহর।
(কুড়মালি)

৩৬। মাথায় গগলির টুঁকি
উপরে উড়ে ছিল
দাদা দেন গুলইনরে
মারে দিব সনার চাঁচির।

৩৭। ভাদর মাসে আওই তেল গাদর জনহার পাওঅই তেলে
এবেক বন্ধু দাদাক বসে
পিঠে ঠেঙ্গা ভাদর মাসেঁ। (কুড়মালি)

৩৮। জয়পুরের বড় নাম, পাথরে ধরেছে আম
রাজা ঘরে—
বড়িরে ধমসা বাজে উচ স্বরে।

৩৯। চৈতি গে চৈতি
মৌহা বিছে যাইতি
পাওতি ত পাওতি
নাহলে বুলি চলি আওতি। (কুড়মালি)

৪০। আমড়া তলে ছামড়া করে
রহ'ব দিনা চার
এমনি গাঁয়ের চৌকিদার
কনঠিনে বসাবি জমাদার।

৪১। বারে বারে বারুণ করি, জাইসনা লদী সিনাতে
কাইল হঁয়েছে মাথা ছুখা আইজ ধরেছে ঝরে।

৪২। আহা দেখেঁ রে দাদাঞ বহু আনহো
লাল গামছা, উড়ল কেঁচা উড়ল আওহো। (কুড়মালি)

৪৩। মাছ ধরি হালা হালা, পলাশ পাতের থালা রে
নদীয়াঞ পড়ল বান, বেসাতির জ্বালা রে।

৪৪। সরু সুতা কাটে কাটে আঁগুল গেল ফাটে
দেন সিধরার মাঞ কাঁচঅ হল'দ বাঁটে।

৪৫। আসাঢ় মাসেঁ আসাড়ি সরাবণে খাজাড়ি
ভাদর মাসেঁ—
জনহারিঞ দেলেইক কাচাড়ি। (কুড়মালি)

৪৬। ঝিঙা ধরেছে জালি
মাঁগে গেলে দিহা খাঁড়া খাঁড়ি হো।

৪৭। আসে ছিল ঝরার রাজা
খাঁঞে গেল মহল ভাজা
রাজা হে—
গামছাটি দিঞে রাখ বাঁধা।

৪৮। আম খাটাই বান সামাইল
চিড়কার লক পালাইল
ভাঁসিল রে কাঁসাই ধারে—
যত ছিল তেলি তামলি, তারা বলে গেলি গেলি
জলহা বেটার গেল পুঁজি—
ভাঁসিল রে কাঁসাই ধারে, কাঁসাই অপারে।

৪৯। ঝিঙা লতের কমর দড়ি, হাল বাইতে পড়ে মরি
দিদি লো, মা গলে বেসাতি জুটে না।

৫০। তাল বাগড়ার ঘর, উড়িসের বেড়ি জোর
এই রে আদরের ঘর—
পেলনিদের কত রে আদর।

আদি ও প্রাচীন ঝুমুরের কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। প্রতিটি ঝুমুর সৃষ্টি হয়েছে কুড়মালি ভাষায়, পরবর্তীকালে কিছু ঝুমুর পরিবর্তিত হয়ে স্থানীয় মৌখিক ভাষার রূপ নেয়। আদি ভাদরিয়া ঝুমুরের শেষ পর্যায়ে ভাদরিয়া ঝুমুরের বিষয় ও আঙ্গিকে পরিবর্তন ঘটে। একে দরবারী ঝুমুরের পূর্ব রূপ বলতে পারি।

উদাহরণ ঃ— কুড়মালি / ভাদরিআ

১। তিনঅ বহিনি মিলি, পানি লাই গেল রে—
হেঁ ভালা, বেঙ্গা রাজাঞ ছেঁকল ডাঁড়ি খাট রে।

২। ছাড় ছাড় বেঙ্গা রাজা, এহে ডাঁড়ি খাটরে
হেঁ ভালা খইলা ডুবাই খারা যাব রে।

৩। নেহি ছাড়ব হামে, এহে ডাঁড়ি খাট রে
হেঁ ভালা হামে লেবো ছুটকি বহিন রে।

৪। এক লাঠি মারল বেঙ্গা, দিঅ লাঠি মারল রে
হেঁ ভালা তিনঅ লাঠিঞ বেঙ্গা টিড়ু আইল রে।

৫। কেহ লেলা ঝুড়ি ঝাঁটি, কেহ লেলা আইগ রে
হেঁ ভালা কেহ লেলা বেঙে কেরি খাইট রে।

৬। গারঅ দিনে থার পাত, বার দিনে খাট রে
হেঁ ভালা তের দিনে কুটুম ফলার রে।

এই পর্যন্ত যে সকল ভাদরিআ ঝুমুরের উদাহরণ দেওয়া গেল তাতে দেখা গেল ভণিতার প্রচলন এতে নেই। প্রাচীন ঝুমুরের এগুলি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। যে কোন লোক সঙ্গীতের মতই ভাদরিআ

ঝুমুরও ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হলেও তা গোষ্ঠীমানসে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কাব্যযুগ ও সবুজ যুগের কবিগণও বহু উল্লেখযোগ্য ভাদরিআ ঝুমুর রচনা করেছেন। যা জনপ্রিয়তায় প্রচলিত আদি ঝুমুরগুলির সমকক্ষ বলা যায়। এই যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য ঝুমুরের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। আসে রহলি বইসে, রহলি পিআকর আসে
রং—হামর ভালি ভালি দিঅ আঁখি থকি গেলি সজনীরে
বঁধুআই বড়ি দাগা দেলি।

২। কহি গেলা দসঅ দিন, বিতলি বরিসাক দিন
হামর জড়ল পিরিতি টুঁটি গেলি।

৩। জুহি চামেলি বেলি, নানা ফুলে সাজাওলি
হামর আঁখি লরে সজিআ ভিজি গেলি।

৪। কহথিন হাড়িরাম, না পুরলি মনস্কাম
মনেক আসা মনেই রহি গেলি।

(কবি হাড়িরাম রায়)

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। কাপাস বুনলি ধঁপা ধঁপা ফর গ
সুতা কাটি ঠেঁঠি বনাই দেবো তর গ

২। এক ফেটি কাটলি দইঅ ফেটি টানলি
তিনঅ ফেটিএঃ ঠেঁঠি হেইএ জাতও তব গ।

৩। ধারে ধারে দিহা তাঁতি চাঁদ, সুরুজোআ
মইধে দিহা তাঁতি জড়া সইতিনিআ
কহে বিনন্দ সিংহে ঝুমইর বনাই বনে
মইধে দিহা তাঁতি জড়া সইতিনিআ॥

(কবি বিনন্দ সিং)

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। মর মনেক কথা কহব কাহাই গ
পিআ বিনু হিআ ধরলে না জাই গ।

২। মাখন ছাঁছি ছেনা কনহ না রুচাই গ
কাঁদি কাঁদি জিউ উঠে কচলাই গ।

৩। গাতে না পাঁও বল, অচল বুঝাই গ
চলইতে মর গড় পড়েলা বাঝাই গ।

৪। এই সন ঝকঝনে পড়ল দীনাঞ গ
কহে হেন দখ মকে দেলা বিধাতাঞ ॥

(কবি দীপা তাঁতি)

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। পানি আনে গেরলি, বনকে পখরিআ
মাঝঅ বনে পিআঁই ছেঁকল ডহরিআ।

২। ঝপটিকে টানিলেলা, হামর আঁচরওআ
হাঁসি হাঁসি মারি দেলো দিঅ আঁখিআ।

৩। বাঁহিআ টানিকে মর, চুমল অধরওআ
কুল নাসি দেলো রসিক নাগরওআ।

৪। রামকুমারে গাওঅই, নাভি সরোবরোআ
পরসনে জুড়াই মদনেকা জরোআ।

(কবি রামকুমাক মাহাত)

ভাদরিআ

১। ঝাড়গাঁর হাঠ যাতে, বিহায়ে ধরল হাথে
বিহাই ছাড় হাথ, ঝুড়ি কাঁটি বিকেই সাঁঝের ভাত।

২। বিলে ঝাড়ে কাম নাই, সকাল সাঁঝে বনে যায়
পেটের জ্বালায় কাটি বনের কাট।

বিরানব্বই

৩। ছট ছট ছানা পনা, অভাব স্বভাব জানে না
ভখের জ্বালায় কাঁদে সারা রাইত।

৪। উধার ধারের বালাই নাই, কেমনে বাঁচব ভাই
মহাজনে বলে ছটঅ জাইত।

(কবি বিজয় মাহাত)

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। মানভুঞানিক বেড়িআস, বিনা হার বরদেক চাস
হামরাক এহে লাল মাটিক বনে
রং—গিরল মহুআ কুড়াই লেহেত কনে।

২। কতেক দিন বাদ মৌহাক পালি
ঘুমে হামরাক কাল হেলি
খেঁচলুক মৌহা উভিলেহেত কনে ?

৩। ঘুরি পালিঞ কি মৌহা গিরতেইক
ততকে খঁচে কঁচড়া ধরতেইক
ভাঁড়ইআরা ভাঁড়ত সভে দিলে।

৪। বাসি মাড়ে মৌহা সিঝা
ঢেঁকি কুটল চার ভুজা
হারুআকর এহে লাস মনে।

(কবি হারাধন মাহাত)

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। সরাবণ মাসেঁ
দিন গেলা আসে
ঝিরি ঝিরি পানিআ বরিসে
সজনী লো (২)
দিন গেলে দিন ঘুরিকে না আসে।

২। আঁধার রাতি
নিমাইকে বাতি
সাথী হারা রাতি রহলি পিআসে।

৩। উতলা সাঁঝে
হিআকর মাঝে
ঝিঙাফুল ফুটি মিটি মিটি হাঁসে।

৪। সুনাগ বরসা
সুনিল ভরসা
নদি চঞ্চলা মিলন পিআসে॥

(কবি সুনীল মাহাতো)

ভাদরিয়া ঝুমুরে তাল

সুরের দিক থেকে আমরা যেমন ঝুমুরের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা দেখতে পাই তেমনি তালের দিক থেকেও এর নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। যা ভারতীয় কোন সঙ্গীতধারার সঙ্গেই মিলে না। ঝুমুরের তাল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন সিল্লীর রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও তাঁর ছোটনাগপুরের তালমঞ্জরী গ্রন্থে। তিনি ঝুমুরে ৮ মাত্রার ক্ষুদ্র তাল থেকে ৪০, ৫০, ৬০ মাত্রার তালের ব্যবহার ঝুমুরে দেখিয়েছেন। ভাদরিআ ঝুমুরে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক তালের ব্যবহার দেখা যায়। এবং অধিকাংশ তাল ৮ মাত্রার হয়ে থাকে। ভাষা ও সুরের সরলতাব সঙ্গে বাজনার বোল বা ঠেকার সরলতা দেখা যায়। ফলে ভাবের ও সাঙ্গিতীক সামঞ্জস্য বিধানে তাল সহায়ক হয়ে উঠে যা যে-কোন উঁচু মানের সঙ্গীতের বড় বৈশিষ্ট।

তালের উদাহরণ—তাল ৮ মাত্রা।

ঠেকা

১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮
ধাধাক্	তুং	।	ধাতুং	—	।	তেরেখেটে	তুদাং	।	—	—
+			২			০			৩	

সুরের গতিবিধি ও তারতম্য অনুসারে ঠেকার বিভিন্নতা ঘটে ও ফাঁকেরও অন্তর ঘটে।

তাল ৮ মাত্রা।

ঠেকা

১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮	
গিদাক্	ধাতুং	|	তাক্	ধাতুং	|	তাক্	ধাতুং	|	তেরেখেটে	তুদাং	|
+			২			৩			০		

এই তালে একটি আদি ভাদরিআ ঝুমুরের স্বরলিপি দেওয়া হল। ঝুমুর—

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। ঝিঙা ফুল তলি তলি
সাঁঝেক্ বেরা জাব তহরাক কুল্হি।

স্বরলিপি

II	গগা	রগা	|	ঃসা	সসা	|	সসা	।	|	।	।	I
	ঝিঙা	ফুল		তলি	তং		লিং	০		০	০	
I	সরা	মমা	|	পমা	মরমা	|	রগা	সা	|	সা	।	II
	সাঁঝেক্	বেরা		জাব	তহরাক্		কুল্	হি		০	০	

এ ক্ষেত্রে মাত্র দুটি তালের উদাহরণ দেওয়া গেল। লয়ের ক্ষেত্রে ঝুমুরগুলি মধ্য লয়ে শুরু হয়ে দ্রুত লয়ে শেষ হয়। একটি ঝুমুর বার বার গাওয়ার মধ্য দিয়ে দ্রুত লয়ের দিকে এগিয়ে যায়। ভাদরিআ ঝুমুরে আনুসঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে মাদলের ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে ঢোল, ধামসা, চেড়্পেটির অনুপ্রবেশ ঘটছে।

দরবারী ঝুমুর

ভাদরিয়া ঝুমুর আঙ্গিক, ভাষা ভাব ও সুরের বিস্তৃতিতে যতটা সহজ সরল ও ছোট, দরবারী ঝুমুর কিন্তু মোটেই তা নয়। কথা, সুর ও তালের দিক থেকে এ ঝুমুর রীতিমত জটিল ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের পরিচয় বহন করে। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি প্রাচীন ভাদরিআ ঝুমুরকে ভিত্তি করে

কীর্তন ও রাগরাগিনীর সংমিশ্রণে দরবারী ঝুমুর সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অবস্থায় দরবারী ঝুমুর লালিত পালিত হয়েছে বিভিন্ন রাজদরবার ও নাচনীর আসরে। এর মধ্যে ময়ূরভঞ্জের রাজা পূর্ণ চন্দ্র ভঞ্জ ও প্রতাপ চন্দ্র ভঞ্জ, সেরাইকেলার উদিত নারায়ণ সিংদেও, সিল্লীর রাজা পশুপতি সিং, উপেন্দ্র নারায়ণ সিংদেও পঞ্চকোটের রাজা জ্যোতি প্রসাদ সিংদেও ঝুমুরের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নিজেরাও ছিলেন উঁচুদরের সঙ্গীত রসিক ও ঝুমুর গায়ক। তা ছাড়াও অনেক ছোট ছোট জমিদার সামন্ত ও মাহাতগণ লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে নাচনীদের ভরণপোষণ করতেন। রাজদরবারেই এই ঝুমুরের উৎপত্তি ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এই ঝুমুরকে দরবারী ঝুমুর বলা হয়। দরবারী ঝুমুর নাচনী নাচের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাচনীগণ এই গান পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নাচ করে থাকেন। তাই আবার একে নাচনীশালা ঝুমুরও বলা হয়ে থাকে। দরবারী ঝুমুর বিভিন্ন প্রকার হয়। যথা—বিরহ, চৈতালি, ত্রিপদি, বারমাস্যা ইত্যাদি। ভাদরিআ ঝুমুরে তো বটেই, বিশেষ করে দরবারী ঝুমুরে শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে বিকৃত স্বরের তথা কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের ব্যবহার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দরবারী ঝুমুরে ভাদরিয়া, কীর্তন ও ধ্রুপদী সুরের অপূর্ব অনায়াস মিলন এই ঝুমুরে এক নূতন সুরের বৈচিত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। অতি সাম্প্রতিককালের একজন উল্লেখযোগ্য ঝুমুর কবির একটি ঝুমুরের স্বরলিপি দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হল। লক্ষ্য করার বিষয়, ভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে ঝুমুরটি ঝুমুর জগতে নূতন দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। ঝুমুর—

দরবারি / কুড়মালি

১। কনে জে ফুঁকই বাঁসেকেরি বাঁসি
ছুধেক্ লেখেঁ ধরজ ইজতি আকর হাঁসি
ফাঁসি পিঁধইতে গপনে সাধেরে
পুরনিমাক্ চাঁদ পিরিতক ফাঁদ
ভুলুক বালিক বাঁধে রে
রং—কাহে হিআ কি চরই কাদেই রে।

২। কন বনে বিসরি আওলো মন
পাওরহঁ কাহা পিরিতি রতন
কনে আঝু আহে মালা পিঁধেইরে
কাকর সেঁওরনে সেল ইজাহানে
রহি রহি হিআ বিঁধেরে।

৩। জন ফুলা কঁঢ়ি জিপাইকে রাখিঅ
জনঅ সুরভি লুকাইকে মাখিঅ
এহে হিআ পিঁজরা মাঝে রে
কনখিলে লর গিরেই ঝর ঝর
কেসে এতেক দিন বাদেরে।

৪। লিল সমুন্দরে লিল কন্ঠি পাইখ
লিল মণি লেখেঁ লিল দিঅ আঁইখ
জরই বিজুরি কাজর বাদেইরে
লিল বরণ পাঁখা লিল সপুণ আঁখা
সুনীল মরণ ফাঁদে রে।
কাহে হিআকি চরই কাদেইরে ॥

(কবি সুনীল মাহাতো)

স্বরলিপি

ধা ধা ধা ধা ধা ধা ণা সা́ সা́ সা́ সা́ সা́
ক নে জে কুঁ ক ই বাঁ সে কে রি বাঁ সি
রা́ গজ্ঞা́ রা́ সা́ ণা ধা পা ধা সা́ণা পা ধা পমা

পা ধা পা ধা ণা ধা পা মা গা মা রা মজ্ঞা
হু ধেক্ লে খেঁ ধ বঅ ইজ্ তি আ কর হাঁ সি
রা সা ণ্া ধ্া ধ্া ণ্া
ফাঁ সি

II সা রা সা | মা জ্ঞা রা I সা রা সা , সা া া I
পিঁ ধই তে গ প নেঁ সা ধে রে ॰ ॰ ॰

I সা রা া | রা া া I গা পা মা | গমা রগা রসা I
পুর ণি মা ক্ চাঁ দ পি রি তি ক্ ফাঁ দ

I ধা া া | মা গা ´সা I রগা মপা মা | মা া া I
ভু লু ক্ বা লি ক্ বাঁ ধে রে ॰ ॰ ॰

I গমা রা মজ্ঞা | রা সা গধা I সা রা সা | মা জ্ঞরা সা I
॰ ॰ ॰ ॰ কা হে হি আ কি চ র ই

I সা রা সা | সা া া II
কাঁ দেই রে ॰ ॰ ॰

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুরের নিয়মবদ্ধ বিকাশ ও পরিণতির জন্য যে-কোন একটি গীতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা—অস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী, আভোগ। সাধারণ নিয়ম অনুসারে সঞ্চারী থেকে গানের সূত্রপাত ঘটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঝুমুরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঝুমুর শুরু হয় তার অন্তরা থেকে। এটা ঝুমুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ছোট ঝুমুরে কেবল অস্থায়ী ও অন্তরা পাওয়া যায়, আবার কোন কোন ঝুমুরে চারটি ভাগই পরিলক্ষিত হয়। রং, ধুয়া বা মাহাদা বলতে অস্থায়ীকে বোঝায় এবং ঝুমুরের কলি বা কড়ি বলতে অন্তরাকে বোঝায়। ভণিতাযুক্ত শেষ কলিটি একাধিকবার গাওয়ার রীতি দেখা যায় এবং পুনঃকথনের মধ্য দিয়ে ঝুমুর দ্রুতলয়ের দিকে এগিয়ে যায় এবং নাচকে চরম মুহূর্তে পৌঁছে দেয়। গায়ক অন্তরা থেকে অস্থায়ীতে ফিরে এলেই মাদরিয়া বা ঢোলিয়া তাল দিতে শুরু করে।

তাল

দরবারী ঝুমুর সুর ও তালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বর বিস্তারে যেমন দেড় সপ্তক জুড়ে সুরের বিস্তৃতি ঘটে তেমনি তালের ক্ষেত্রেও কখনও কখনও ৪০, ৫০ বা ৬০ মাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

ঝুড়ন, বরুটাইড়, ছোয়াড়ী, ফুলওয়ারী তালে ১৮, ২৪, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৪০, ৩২ বিভিন্ন মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়। দরবারী ঝুমুরেও আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মাদল ঢোল ধামসা, চেড়পেটি, সাহনাই, বাঁশে রবাঁশি, হারমোনিয়াম ও খাপ্যার ব্যবহার দেখা যায়।

ঝুমুর সাহিত্য

ঝুমুর মূলতঃ সঙ্গীত হলেও সাহিত্যের বিচারে ঝুমুর এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার-স্বরূপ। যে-কোন ভাষার গীতিকাব্যের মতোই ঝুমুর এক অনন্য কাব্য সাহিত্য। এই কাব্য-সাহিত্যের মূল স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে, এখানকার মালভূমি, অরণ্যময় পার্বত্যভূমি, বিচিত্র আদিম ভাষাভাষী ও জাতিগুলির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার প্রাণরসে সঞ্চিত হয়ে। এক কথায় ঝুমুর যথার্থ ঝাড়খণ্ডী জীবন ও সমাজের দর্পণ স্বরূপ। এই বিশাল ঝুমুর-সাহিত্য রচিত হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতিগুলির নিজস্ব ভাষায়। এর মধ্যে অন্যতম ভাষাগুলি হলো—কুড়মালি বাংলা, ওড়িয়া, নাগপুরিয়া, মুণ্ডারি ইত্যাদি।

হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা বিরহ, মান অভিমান, সামাজিক, রীতি-নীতি অধ্যাত্মভাবনা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দৈব দুর্ঘটনা, ঐতিহাসিক পৌরাণিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল বিষয় ঝুমুরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই ঝুমুর এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেমন অন্যতম লোকমাধ্যম হিসাবে দেখা দিয়েছে তেমনি সমাজজীবনের সমস্ত চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে ঝুমুরে তা আলোচনাকালে আমরা দেখতে পাব। যেসকল বিখ্যাত ঝুমুর কবি তাদের রচনায় ঝুমুর সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন তাদের মধ্যে কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বিনন্দ সিং, তুলসী দাস বাউল দাস, ভীমা, জগৎ কবিরাজ, দীনা তাঁতী, সৃষ্টিধর মাহাত উদয় কামার চামু কামার, অধু কামার, পীতাম্বর দাস, নীলকণ্ঠ, হাড়িরাম রায় বরজুরাম নরোত্তমা, গোরাঙ্গিয়া, রামেশ্বর, পরেশ কামার, দ্বীজ টিমা গদাধর চৌধুরী, ঘাসিরাম মাহাত, বৃন্দাবনা, দুর্যোধনা,

কৃত্তিবাস কর্মকার, সলাবত মাহাত, সুনীল মাহাতো, নিরঞ্জন মাহাত, হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড়, হারাধন মাহাত, করমবীর মাহাত, অমৃতা সহিস, ভরত কুমার, অজিত মহম্মদ, অজমত সেখ, হুবলাল কর্মকার, বিপিন মুখি অনন্ত মাহাত, বাগেশ্বর মাহাত, মিলন, বুধু বাবু, লাকুবুদরা, রাম কুমার মাহাত, মনোরঞ্জন পাণ্ডে, আকুল, বিজয় মাহাত, গিরীশ মহান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উড়িষ্যার বিখ্যাত ঝুমুর গবেষক গিরীশ মহান্ত পুরো ঝুমুর সাহিত্যকে চারটি যুগে বিভক্ত করেছেন। যথা—আদিযুগ, মধ্যযুগ, কাব্যযুগ বা আধুনিকযুগ ও সবুজযুগ।

১৭৫০ খৃঃ পূর্ববর্তী কাল আদিযুগ, ১৭৫০ খৃঃ থেকে ১৮৫০ খৃঃ পর্যন্ত মধ্যযুগ, ১৮৫০ খৃঃ থেকে ১৯৫০ খৃঃ পর্যন্ত কাব্যযুগ এবং ১৯৫০-এর পরবর্তীকাল সবুজযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। আদি যুগের ঝুমুরে ভণিতার প্রচলন ছিল না, ঝুমুরে ছিল সামাজিক মালিকানা। মধ্যযুগে ঝুমুরে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকে অনেক সমৃদ্ধি ঘটে। কাব্যযুগ ঝুমুরের স্বর্ণযুগ। এই যুগে ঝুমুর-সাহিত্যে বহু অসাধারণ কবির সমাবেশ দেখা যায়। তাদের দানে ঝুমুর-সাহিত্য ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। যে-কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপাদানগুলি যথা—রস, অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ এই যুগে দেখা যায়। যার সমৃদ্ধি ঝুমুর সাহিত্যকে যে-কোন সাহিত্যের সমতুল পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এমন-কি সংস্কৃত সাহিত্যে যত রকম অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে এ যুগের ঝুমুর সাহিত্যেও তার সব কটির যথার্থ প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। অনুপ্রাস, যমক, বিরোধাভাস, শ্লেষ, উপমা, ব্যাসকুট, মেষযুদ্ধ, গোমূত্র ছন্দ, শৃঙ্খলা ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এই যুগে হয়েছিল। উদাহরণ সহযোগে আমরা কিছু আলোচনা করব। অলঙ্কার দুই প্রকার, যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালংকার ঃ

ভাদরিআ / কুড়মালি

সাঁমেক খিআনে বাতুল গিআনে
পাণিআ পিঅইতে হিটকলরে নন্দসুভাই
সইঅনে ঝটকলি, পঁইরিআ চটকলি
ছিটকলি খিড়কিএঃ লটকলরে নন্দসুভাই।
সখি আঁখি মিটকল বহি পানি সটকল
চালে জেইসন চিংড়ি ছিটকলরে নন্দসুভাই।
ভীমে ধরাই অটকলি সাত পুরুষ উটকলি
পটকলি খইলা মটকলরে নন্দসুভাই। (ভীমা)

দরবারী / বাংলা

তবে বিনদ ফুলের বিনদ মালা
বিনদ বিনদে সাজে ভাল
এমন বিনদ নাগরে নিরখি
কোন বিনোদিনী বাঁচে বল। (রামকৃষ্ণ)

দরবারী / কুড়মালি

লিল সমুন্দরে লিল কণ্টি পাইখ
লিল মনি লোখেঁ লিল ছিঅ আঁইখ
ঝরই বিজুরি কাজর বাদেইরে
লিল বরণ পাঁখা লিল সপুন আখাঁ
সুনীল মরণ ফাঁদে রে। (সুনীল মাহাতো)

দরবারী / বাংলা

মধ্যযমক

১। হইল অবস বসন্তে রাধা
চিত্তে চিন্তা চিন্তামণির সদা
হইল ঝর ঝর কামে কামিনী
কৃষ্ণের বিরহে রহে না জীবন
বল কি করিব সজনী
হইল ঝর ঝর কামে কামিনী।

আদ্যযমক

২। ক-ত করমে লিখিল মন্দ
সু-সুখ কালেতে ত্যাজি গোবিন্দ
(ধনি) কু-কুবুজার প্রেমে মজিল
শশধরা সনে সে সেবে চরণে
ক-কত প্রাণে না পাইল।

সর্ব যমক

৩। নীলকণ্ঠ স্বরে না রহে জীবন
নীলকণ্ঠ স্মারে রাখিব জীবন
(ধনি) বিপত্তির বিনে বিপত্তি
দীন জগন্নাথের প্রভু জগন্নাথের
পদে থাকে যেন ভকতি।

(কবি জগন্নাথ)

সাংকেতিক শব্দালংকার ঃ

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। বিপতি বিহিনে বিপত্তি ভেল
শ্রীপতি পিরীতে ইতি কি দেল
ছিছি পিরীতি কি রীতি—
মকর কেউর মকর জেসন হরি রিপুরীতি গতি গো —
যাদব সুত মাধব ধর রীতি। (তুলসীদাস)

অংকানুবাদ

২। রাধা কর ধরি বলেন হরি
শুন শুন ওগো বিম্বাধারী
অষ্ট নব যোগ বিংশেতে বিয়োগ
অংশ মাগি বিনয় করি গো
'না' বলিলে তনুতনু হবে, শরঘাতে সমভুবারী গো। (ভীমা)

অর্থাৎ

অষ্ট নব যোগ মানে ৮ + ৯ = ১৭,

বিংশেতে বিয়োগ = ২০ − ১৭ = ৩

অগে তিন = মেষ, বৃষ, মিথুন, অর্থাৎ আমি মিথুন চাই।

অর্থালংকার

১। জৈসন পূর্ণিমা চাঁদ করই ঝিকিমিকি গ
তৈসন ধনি সোভে মুতর গ
জৈসন উজর কনক চাঁপা ফুল গ
তৈসন ধনি তব অঙ্গ গোর গ।

(ভবপ্রীতা)

১। কজনাতে হচ্ছে খেলা, সে জানিবে করির খেলা
ত্রিগুণেতে তিরির খেলা চৌকায় চার বেদেতে
রং—এসেছ বসেছ ভবে তাস খেলিতে।

৩। পঞ্চভূতে পঞ্জা খানা, ছয় রিপুতে দিচ্ছে হানা
সাত সমুদ্র সাতি খানা
খুজলে পাবে দেহেতে।

(মঙ্গল ডম)

দরবারী / বাংলা

১। যদি মম হিতে অলিপ্রিয় পুরে
সস্ত্রীক শশী মিলি দিবাকরে
তবে শুন অরে সহচরী
হয়ে সিন্ধু দিখি, কালে কালা মিশি
আসবি সরে করে ঋষি পুরি হে
রং—শ্রীবৎস সুন্দরী সখি সঙ্গে করি
রহিলাম আশা ধরি।

(কবি গঙ্গাধর তাঁতি)

বিভিন্ন অলঙ্কারের সামান্য কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল। বিশাল ঝুমুর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা নিতান্তই তুচ্ছ। এ পর্যন্ত ঝুমুর সাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ণ হয়নি। যোগ্য ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন এই আমরা আশা করি। ঝুমুর সাহিত্যের স্বরূপ যথার্থ উদ্‌ঘাটিত হলে এক বিরাট সাহিত্য-জগতের উদ্‌ঘাটন হবে বলে আমি মনে করি। তাহলেই ঝুমুর ফিরে পাবে তার হারানো সম্মান, সেই সঙ্গে একটি বিরাট জাতি ও সাংস্কৃতিক জগত্।

ঝুমুর ঝাড়খণ্ডী সমাজের দর্পণ ও উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম

সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বিচার করলে লোকসাহিত্যে আরও যথার্থভাবে সমাজের প্রতিফলন দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, কিন্তু লোকসঙ্গীত তথা লোকসাহিত্যের মধ্যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ যে চিত্র ফুটে তা আমাদের সেই সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করতে সাহায্য করে। কোন জাতিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে তার লোকসাহিত্যকে ও লোকসঙ্গীতকে অনুধাবন করতেই হবে। লোকসাহিত্যের মধ্যেই জাতির মর্মের কথা সহজভাবে ধরা পড়ে। এ ক্ষেত্রে ঝুমুর অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। ওই সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ ঝুমুরের মধ্যে যেমনটি ফুটে উঠেছে তেমনটি আর কোন গীত, নৃত্য শাখায় দেখা যায় না। ঝুমুর লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেও এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানকার মানুষের কাজকর্মের বর্ণনা, কৃষির সমস্যা, জলের সমস্যা, পারিবারিক চিত্র, দাম্পত্য জীবন, প্রেম, দুঃখ, বেদনা, বিক্ষোভ, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যুগের পরিবর্তনে সমাজও পরিবর্তিত পরিস্থিতি, খাদ্যাভাব, কাজের সংকট, অধ্যাত্মচিন্তা, এককথায় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্ত দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। উদাহরণ দিয়ে তা বোঝান যাক।

কর্মভিত্তিক প্রাচীন ঝুমুর

কুড়মালি

১। বড় গাছ কাটি কুটি বনালিস খানি
চাঁই রট রট ঘুরত ঘানি
ঝুমকা ঝুরি চুকুআ ছাঁদনি
কহে কুলন্ত মাইরি কতেক লোবে বানি।

কৃষি সম্বন্ধীয় উপদেশমূলক

১। চাস সে জগতেক প্রাণ
উত্তম খেতি, মধ্যম বান, নিরধিন চাকরি ভিখ নিধান
চৈতে করলা, মরিচ, কোঁহড়া, চাস করলে জাতো জালা
খাবে সুখে ছাড়তোও দুখে
কবও নি তর হেতোও টান
বইশাখ, জেঠে বুনিস ধান, আষাঢ়ে কাপাস পান....

(সৃষ্টিধর মাহাত)

সামাজিক সমস্যা

১। গেলছিলি শ্বশুর ঘর, আনব বলে আপন ঘর
শাশুড়ির মন আগুনের মতন
রে পামর মন বুঝি বিদায় হবে না এখন। (চামু)

উচ্চনীচ ভেদাভেদ তথা বর্ণ সমস্যা

১। ব্রাহ্মণ বর্ণেতে শ্রেষ্ঠ
সকল কাজেতে অনিষ্ট
মালিক ভদ্র কুটিল কু জনায় হে
ডিমডিহায় উচিত বিচার নাই।

২। বল্হি কায়স্থ বা'না
চক্রবর্ত্তি ময়রা খুনা
ভুমিজ নাপিত বৈষ্ণব টোলায় হে।

৩। কুড়মি, কুমহার, বাউরী
দেশআলি, ডম, কুইরি
ছুথার, ভূঞুয়া, বাগাল গুয়ালাই হে।

৪। কুলহু, জলহা, কামারে,
অসতে যায় দহতরে
মনবধা মালিক জানায় হে। (মনবধা)

যুগ ও সামাজিক পরিবর্তন

১। কলি যুগের এই রীতি, স্ত্রী কহে স্বামীর প্রতি
দেহে কিনে বেনি ঢাকা জাল
নাই দিবি ত চলে যাব কাল। (ভাদরিআ)

অথবা—

২। সধবা বিধবা নারী, চিন্‌হা দায় হল্য হরি
কলেজ পাড়া ফাইন শাড়ি
পায়ে আলতা গো লাগায়—
এই কলিতে চেয়ে দেখ ললিতে
সধবা বিধবা নারী চিন্‌হা হল্য দায়॥ (অজিত মহম্মদ)

বৃত্তি ব্যবস্থার ধ্বংস

ভাদরিআ / কুড়মালি

১। এসনে হেলেইক কলি কাল
বামনে ধরল হাল
নিজেক মনে দেখা বিচার করি
কারখানায় দেশ লেলা ভরি।

২। কলেক তাঁত তৈরি ভেল
জলহা তাঁতি ডুবি গেল
তেলেক মিলে তেলি গেলা মরি।

৩। টেবুল চিআরে বসি
আগু তলে রহই আড়সি
এখন ঘারে বসি কাটি লেহো দাড়ি।

৪। ভুবলাল কহই সুনা ভাই
হামর বুদ্ধি কিছুই নাই
ভুনিআই চলেহেইক ছাপাই সাড়ি॥ (ভুবলাল কামার)

গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস ও চাকরী

রং—আমি রইব না ঘরে
চাকরি করব সুখে থাকব চল যাই গ শহরে।

১। কুলুর বলদের মত, কাজ আমি করি যত
বাপে বলে বেটা খাই ঘুরে ফেরে।

২। মাএ বলে মুহজারা, বৌদি বলে কামচরা
বড় দাদা ভিনু করার কথা বলে বারে বারে।

৩। চাকরি করব সুখে থাকব, শায়া শাড়ি কিনে দিব
তিনটি ছেল্যা করব হামরা থাকব সুখের সংসারে।

নারী নির্যাতন

কুড়মালি / ভাদরিআ

১। ছোওআ কাঁদই অরল গরল, গাহাইলে গবর ভরল
সাসে ননদে রঙ দেখা
কিনা করম মএ একা।

২। মাএ বেটিক একে টেঢ়ি, নিছুউতা ঢেঁকি কাঁড়ি
বসি বসি দেখত জেসন ভেকা।

৩। খেতি বাড়ি ছুরন দেসে, ভাত লেইকে জাম কেসে
ডেরি হেলে বকত মকে লেকা।

৪। চাসেক কামটা চাড়াচাড়ি, আর না করিহা ডেরি
তুলসিক দুখেক নেহি লেখা॥

দাম্পত্য সমস্যা

ভাদরিআ

১। রাজা মহারাজের দেনা, মিনার মাই কিছুই বুঝে না
খুজে শুধু বসন ভুষণ
বাঁকে গেল মিনার মাএের মন
যেমন কুকুরের নেজেরি মতন।

২। পাব বলে ছিল আশা, মিনার মাএের ভালবাসা
ইটা কেবল উপরা যতন।

৩। যদি দি পইসা কড়ি, খাতে পাথি ভাত মুড়ি
ইটা কেবল উপরা যতন।

৪। দ্বিজ গদাধরে বলে, মিনার মাএের কথায় চললে
দেখি হামি নিকটে মরণ। (গদাধর)

নারীর মর্যাদা

দরবারী

নারীকে না বাসিও পর
নারী বরে শিবশম্ভু অজয় অমর।

১। চাঁদ বেনের সাত সুত, নারী বরে হয় জীবিত
নারী বরে বীর হনুমান চারি যুগে অমর।

২। নারী হইতে এই মেদিনী, সৃষ্টি হয় শাস্ত্রেতে শুনি
নারীর অন্ত নাহি জানে বলে ললিত কিশোর॥

(ললিত মাহাত)

কঠোর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ও দাম্পত্য প্রেমে ভাঙ্গন

১। কি দেখে মা বিহা দিলি
সনার অঙ্গ হল্য কালি
কাজ কি আমার এ ছার প্রাণে
ঝাঁপ দিব জড়ের বাণেতে
দেশেতে কি রঙ উঠেছে মা এনেফ কাঁটাতে।

২। দু জনাতে একটি চুয়া, তাথেও লাগে দু পহর বেলা
কিছু হলেই বাবু ভইয়াই মারে গাঁতের বেঁটেতে।

৩। গাঁইত কদাল গেল চুরি
বাঁধা গেল গিরীশ বাউরী
সকাল হলে মাথায় ঝড়া,
মায়ল ঘাঁটা মাটির হাঁড়িতে॥

অন্যান্য সমাজের মত অধুনা পণপ্রথা এই সমাজকে আক্রমণ করেছে। বর ও কনে পক্ষের মানসিকতা ও সমাজের ভয়াবহ পরিস্থিতি এই ঝুমুরটিতে ধরা পড়েছে—

১। কি করতে কি হল্য ইটা, শুরু হল্য পণ প্রথা
শুনে হামার লাগে গেল ধাঁধা
আমার তিনটা বিটি বড় হল্য, একটারও নাই বিহা হলা
পেটের ভখ চাখের ঘুম গেল।
রং—বিটির বাপের ঘুম হয় নাই, বেটার বাপ পাক দিছে মচে
তর বেটার কি বিটি হবেক নাই তুই ভাবিস কি মতে॥

২। যার বাপের একটা বেটা, তার কথা আচকা আচকা
আগুস ফাটা কথা বুলে মুহে
সনা লিব দশ ভরি, যাত্রীর লাগে ভাড়ায় লরি
বরের ঝকঝকা টেসকি চায়—
রং—এমত না চুক্তি হলে বিহা হবেক কি মতে
ভাল বলে বলি এই কথা কুটুমের সাক্ষাতে।

৩। যার বেটা অলহ কঁক ভকভঁড়, টেংগিলা সরু পেট টা দড়
ভখাছে ন মাঞে জানে সেটা
রংটা খসখসা কাল, কনাটা তার হওয়া চাই ভাল
মিছা কথা বলি নাই ভাই ইটা।
রং—তার বাপে বলে ছেল্যা ভাল আমার শুনহে বেহাই
নগদ কিছু দিঞে থুঞে সক্ষম বিহাটা চালাও।

একশো নয়

৪। যার তুটি পুননা ধান তার কথা আনলে আন
এক নিমিষে হাজার কথা বলে
আমি কারও বাপের ধারি, ন কাকেও হামি পরোয়া করি
গেঁট হয়ে বলে এই কথা।
রং—কর্মবীর মাহাত বলে দেশটা গেল রসাতলে
থ দিলেও শেষে থ পাবি না
পণ প্রথা না গুছালে॥ (কর্মবীর মাহাত)

মদের সমস্যা

কুড়মালি

১। জিউ গেলোও খাটি খাটি
নেহি জুটঅ মাড় পানি
মদ খরেক সগেঁ বিহা গ দেলে মাএঃ
হামর খাইল মাড়টাও পানি।

২। জমি বাড়ি ঘটি বাটি
সভে দেলাক গ বেচি
মুহজারাক সগেঁ হামে গ কহেঁ মাএঃ
কেইসনে রহম বাঁচি।

৩। নিতই নিতই কলহ কচঅ
ভাড়া ভাচাএঃ গ বাঁচা
দিনে রাইতে মাইর খাওআ হে সুনীল
একেই মরা বাঁচা।

(সুনীল মাহাতো)

বর্তমানে সেচের জন্য বিভিন্ন জায়গাতে ড্যাম বা জলাধার তৈরি হচ্ছে। জলাধারে পুরুলিয়ার বহু জমি যাচ্ছে জলের তলায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেচের জল কিম্বা চাকরি পাচ্ছে বাইরের মানুষ। নিম্নোক্ত ঝুমুরটিতে এর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—

কুড়মালি

১। বনবাদাড় কাটি কুটি
বাঘ ভালুক ঢাড়াই পিটি
বসমতাঞ বনাওল বসত হে
রং — (আইজ) সে বসতি পানিঞ ডুবাই দেল রে
হিরদয়ে নিরদয় শেল।

২। মরদ জেনি খাটি লুটি
সাঁঝ বিহান মাটি কাটি
খেতি বাড়ি বনাওল সুয়র হে
সে খেতি কারখানাঞ লুটি লেল রে।

৩। হামরাক গেলি জমিজমা
হামরাক চইখেই খেদা ধুআ
মুখ্‌খু ছোওআ বাগাল খাটি খাই রে
(নকরিঞ) বাহারি সভ বহালি ভেল রে।

৪। মারা বুরুই জাম দেল
জীবনেক কি দাম ভেল
ভুখে মরি মরণ কেইসন রে
দেখা সুনীলেক বাঁচা মরাক খেইল রে।

(সুনীল মাহাতো)

১। ঘর বাড়ী ছিল ডেমে ডুবে গেল
আমরা গুমুরে গুমুরে মরি হে
সুবর্ণরেখার তীরে কাঁসাই দামুদরে
ডেমে ডেমে গেল ভরি হে
রং—স্বাধীনে অধিনে রহিল জীবন
আমরা বাঁচিব বল কি করি হে।

২। জমিভূমি ছিল কারখানায় ঘেরিল
আমাদের নসিবে নাই চাকুরি হে
রাউরকেল্লা মুরি, টাটা মারাফরি
বিদেশিরায় গেল ভরি হে ॥

৩। মাতৃভাষা সার করিল টেনেসফার
আমরা কেহ বুঝিতে না পারি হে
অফিস আদালতে শুনি দু কানেতে
ইগেঁর গিজি দিল ভরি হে।

৪। কৃত্তিবাস ভনে ভবিষ্যৎ জীবনে
নব রূপে কিনা হেরি হে
যে কেহ দরদী তারাই হল্য বাদী
যুগে কেহ নাই ব্রহ্মচারী হে ॥ (কৃত্তিবাস কর্মকার)

ব্যাপক ভাবে বন উচ্ছেদের ফলে এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। নিম্নোক্ত ঝুমুরটিতে তারই বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে।

ভাদরিআ

১। পাত তুলি নিতি নিতি
ঝুড়ি ঝাঁটি দাতন কাঠি
আইজ কেনে বাবুই করে মানা
উয়াদের বন নাই ছিল জানা।

২। সাল পাতের পতরি
দকান বাবুর দরাদরি
লৌতন পইসা নাই জানি শুনা।

৩। সরু সরু সাল ঝাঁটি
ভাঁগে করি দাতন কাঠি
দাতইন বিকে হয় দু চার আনা।

৪। ঝুড়ি ঝাঁটি বিকি কিনি
ঘাম ঝিঁটা মাড় পানি
আইজ কেনে করে জরিমানা
কি করে বাঁচার ছানাপুনা। (সুনীল মাহাত)

আটত্রিশ বছর স্বাধীনতার পরেও অবহেলিত ও বঞ্চিতই রয়ে গেছে এখানকার মানুষ। শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, চাকুরির, এক কথায় জীবনের সবদিকে এরা পিছিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের আর সকল মানুষের চেয়ে। এই সমস্যার সমাধানে সারা অঞ্চলে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়, যার পরিণতি ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। ঝুমুরের মধ্যে এই আন্দোলনে মানুষের বিক্ষোভের যে চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় তা সত্যিই অভিনব।

১। বেঙ্গল বলে তুঁই ছটঅ
বিহার বলে তুর হটো
পুরল্যা কি ঝাঁপ দিবেক জলে
রং—বাঙ্গালি ভাই বিহারি ভাই দেন টুকু বলে।

২। সাঁওতালডি বিজলি কারখানা
মেঘের উপর তার টানা
টাটা কইলকাতায় পাঁখা চলে।

৩। খাপরা পিঠা খরাঞ গেল
চিপে চাপে মরাঞ দিল
সুনীলে কি পৌঁদা কথায় বলে। (সুনীল মাহাত)

১। উড়িষ্যাতে লয় উড়িয়া
পশ্চিমেতে লয় পজিয়া
বাংলাতে লয় যদি বাঙালি হে
হামরা কি উপরলে টপকিলি
তরাই সকল বাঁটে সারে লিলি হে। রং

২। খনির কয়লা তামা পিতল
লাহের কুঠি নদীয়ার জল
বন জঙ্গল উজাড় করে দিলি হে ॥

(হাজারী প্রসাদ রাজোয়াড়)

৩। এত বছর স্বাধীনতা কে বা মাতা কে বা পিতা
আমদের বেদনা বুঝিল না
দেখ ভাভে দেখ, দু নয়নে দেখ
তাদের বুঝা যায় না ছলনা
রং—জাগে উঠ ঝাড়খণ্ড বাসী
দেখ পরের কথায় ভুল না।

(কৃত্তিবাস)

অথবা—

১। এই মাটিতে জন্ম মোদের আজ ১৬ জেলা কার
আগাম দিগাম ভাবে দেখ সারা ভারতবর্ষের সার রে।

২। অভ্র লোহা তামা পিতল, বিজলি বাতির তার
মাটির ভিতর কাল সনা আমদের নাই কি অধিকার রে।

৩। খাল বিল নদ নদী অ ভাই রয়েছে বিস্তার
নদী বাঁধে পূবে সেচ ডুবল জমিন কার রে।

৪। ৩৪ বছর স্বাধীনতা তবু উপায় নাই বাঁচার
আইজ ধর ধনুক, লাগাও চড়া সইব কত আর রে
ও ভাই ঝাড়খণ্ড বর্ণনা করে কৃত্তিবাস কামার রে ॥

(কৃত্তিবাস কর্মকার)

বারমাস্যা ঝুমুর

কুড়মালি

১। মরদ –চালে ধনি সুনে কথা. করিস না আর মনে ব্যাথা

নেইহব ছাড়ি চালে হামর সগেঁ

ছাড়ে এবে নেই হর বাস, আওঅল আঘন মাস

ভাভি দেখেঁ তঁই নিজেক মনে।

এখন যদি নেহি যাওবে, পিছু যাই তঞঃ কিনা করবে

অন্ন বিনে মরবে জিবনে

আইজ পিঠালাঠা কারেঁ মর কথা তঁই ধরেঁ

বিধি মিলাওলো হামর সনে ॥

রং—আঘন পোসেক দিনে জদি রহবে নই হরে

কিনা লাই জাবে ধনি তবে তঁই হামর ঘারে ॥

২। জেনি রং—সুনে সঞআ ঘুরি জাঞ তঁই না করিস ব্যথা

কামেকর নাম সুনি হামর ধরি গেল মাথা ॥

মাগ ফাগুন মাসে, সাজি আওবে বরেক বেসে

চৈতেক পরব রহইক জেসন গাঁথা—

সাড়িক কথা কহলে তকে রাগ দেখাওকে তো মকে

সুনি মাইরি ধরত তর মাথা।

ব'সাক জেঠেক দিনে হাঁসি খেলব তর সাগেঁ

হামর প্রতি নেইখো তর দয়া—

মনেক কথা কিনা কহব ভায়েক দুখ কাতেক সহব

ভায়েক উপর বেড়ি মর মাঞআ ॥

রং—আসাঢ় সরাবন মাসে সঞআ চাসেকর দিনে

নেহি আওবে লেগে হো মকে ধরি চরণে ॥

একশো পনের

৩। মরদ রং—দেখে ধনি চাসেক দিনেও যদি ঘুরাওবে মকে
কেথিক লাগি তবে বিহা হামে করলিও তকে।
কতেক সহব হাম বিধি তোর হেলো বাম
বুঝলিও হামে তর মতি—
বাপেক ঘারেক বেড়ি নাম মর ঘারে নেখি কাম
বাহারে কলিযুগেক জেনিক রিতি।
আসাঢ় সরাবন হিঁআ রহবে, ভাই এক সংগে কাম করবে
তখন তর দুখ হেতো নেহি
চালে দেবো সাইআ সাড়ি, বারেক লেই আনবো গাড়ি
জতেক কহবে সভি আনব বহি॥
রা—সুনে ধনি মকে তঁই আর না করিস হাই নি সাস
নেহি গেলে তএ ধনি হামর বহি জাতি চাস॥

৪। জেনি রং—বেড়িরে আদর ভেলো হামর ভাইরে দুলাল
নেহি জাবো নেহি লেবো সাড়ি না করিস দালাল।
রাগ করিস না সুনে কথা টুএক ভাবে মর কথা
না করিস মকে গালাগালি—
সুনে সঁইয়া তর গড়ে ধরি, এহে বারে জাঁই ঘুরি
ভাদর মাসে আইলেই যাব চলি।
ভাদরে করম খেলি জাইবো তর সগেঁ চলি
আসিনে দুগ্‌গা পুজা দেখে জাব
সত্যি করি কহবে মকে, নইহর আওএ হেতো তকে
নেহি আওলে তর মাথা খাব॥
রং—মাএে বাপে জনম দেল ভাএক বেড়িরে আদর
কামেক দিনে আইলে মাইরি না ছাড়ব নইহর॥

৫। মরদ রং—বুঝলিও মর সগেঁ তএঃ আর না করবে ঘার
নিজেক মুক্তি ধরব হামে তর আসে রহা বেকার।
বারে বারে জাব ঘুরি, নেইহরে দেবো সাইআ সাড়ি
এইসন বকা তএঃ মকে ঠানিস—
কাত্তিক মাসে কালি পুজা, দেবো হামে তকে সাজা
হামর ভাতেক আসা না করিস।
দেখেঁ তবে হামর মাইর সই তিনেক খাওআবো গহাইড়
লেই আনব দসর বিহা করি
কলি জুগেক বহু বেটি, আনা ভার ভাই মারি পিটি
গরমেট্ আইন করি দে তো জারি॥
রং—নেহি জাবে তবে হামে একাই কাটব কইসে দিন
দসর করি লেই আনব হামে তর সইতিন॥

৬। জেনি রং—এসন কথা না কহিস সঁইআ বারেক হামে জাব
সইতিনেকর বেড়ি লেটা মাইরি কাঁদি কাঁদি যাব॥
কাম নেহি আর ঝগড়াঝাঁটি চালে জাবো হাঁটি হাঁটি
তর সগেঁই জাব হামে চলি
নেহি আওবো নইহরে আর, চালে জাব আপন ঘার
আর না করিহা গালাগালি।
জতেক দিন ডাঁগা রহব, তর কথা মএঃ সহব
তাকর পর করব হেরিফেরি
জেনি জনম জখন বিধি দেল তখন রাখেলাই হেতি মেল
আর না করব হামে ডেরি।
রং—বার মাস নেই হরেক আস হামর কুরাইএ গেলি
জেনি জনম পরেক বসে রে মন মিছাই জাই চলি।
মরদ রং—সইতিনেকর নাম সুনি ধনি সএঃআক সগেঁ জাই
গালাগালি কাহে তবে ভনে নিরনজন গাই॥

(নিরনজন মাহাতো)

এ ছাড়াও আরও বহু বিষয়ের উপর ঝুমুর রচিত হয়ে থাকে। ঝুমুরের আসর ও নাচনীর আসরে যখন এই গীতগুলি গাওয়া হয় আসরের শ্রোতাগণ মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করে। কখনো উল্লসিত হয় আনন্দে কখনো ভারাক্রান্ত হয় বেদনায় কখনো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শ্রোতাগণও ঝুমুর শিখে নেয় সেই আসর থেকে।

ঝুমুর ও সমকালীন সঙ্গীত ও সাহিত্য

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি ঝুমুর কেবল এক বিশাল সঙ্গীত জগতেই নয় সাহিত্যিক বিচারে বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডারও বটে। ভবপ্রীতা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বিনন্দ সিং তুলসী দাস, বাউল দাস, সৃষ্টিধর সিং মাহাত প্রভৃতি কবিগনের কাব্য-প্রতিভা যে কোন কবির সঙ্গেই তুলনা করা চলে। কোন্ আদিকাল থেকে যে ঝুমুর সাহিত্যের সুচনা হয়েছে এবং কত প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবি যে ঝুমুর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

যে কয়টি ধর্মমত এই সমাজ তথা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র গ্রন্থে এখানকার মানুষ কর্তৃক কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার ঘটনার উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এই সমাজগুলির উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়। বহু মানুষ এই ধর্মমত গ্রহণও করে। আজও ঝাড়খণ্ডের বিস্তৃত অঞ্চলে বহু বিরাট বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির ও স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদার ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই এদের প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ঝুমুরও আঞ্চলিক সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় আদি ঝুমুরের কোন লিখিত রূপ না থাকায় তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যও তাই। আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে কুরমালি ছিল প্রধান ভাষা। এর নিদর্শন পাওয়া যায় এই অঞ্চলের আদি সাহিত্যে

চর্যাপদে। চর্যাপদের শতকরা ৯০ ভাগ শব্দই কুড়মালি। তা-ছাড়া চর্যাপদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ এখানকার আঞ্চলিক বিষয় ও ভাব সম্বলিত ছিল। এগুলি গীত হিসাবে গাওয়া হত এবং এর সুর ছিল সম্পূর্ণ দেশীয় রাগ-রাগিনী ভিত্তিক। যেমন—দেশাখ্য বা দেশীয়, শাবরী বা পার্বত্য, বরাড়ি প্রধান। পার্বত্য বা পাহাড়িয়া সুর আজও ঝুমুরে গাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকগণের মতই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ ঝুমুরকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। আসলে চর্যাপদগুলি আদি কুড়মালি ঝুমুরের শ্রেষ্ঠ নমুনা। এর বিষয়, ভাব ভাষা ও সুরেই এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। চর্যাচর্যের কবিদের নামের সঙ্গেও ঝাড়খণ্ডি নামের হুবহু মিল দেখা যায়। যেমন—লুইপাদ, ভুসকিপাদ, কানহুপাদ ইত্যাদি। চর্যাপদের দাবীদারের আজ অভাব নেই। এ নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা আলোচনা সমালোচনা চলছে বিস্তর। তবে আমার মতে কুড়মালির দাবীই বোধ হয় প্রধান বলে বিবেচিত হবে। বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহোদয়ও চর্যাচর্য বিনিশ্চয়কে বাংলা ভাষার দাবীর বিপক্ষে মত পোষণ করেছেন।

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়-এর কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হলে তার পরবর্তীকালে একজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটে, তিনি মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির রচিত পদ ও ভাষায় কুড়মালি ঝুমুরের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বলা যায় বিদ্যাপতিও পদ ও সুরের ক্ষেত্রে ঝুমুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির একটি পদের নমুনা দেওয়া যেতে পারে—

কালিক অবধি কইএ পিআ গেল
লিখইতে কালি ভিত ভরি গেল
হেল প্রভাত বাহত সবহি
কহ কহ সজনী কালি কবহি॥

এখানে কালিক (কালুক) অবধি, কইএ, পিয়া, গেল, লিখইতে ভিত, ভরি, হেল বাহত, সবহি, কবহি ইত্যাদি শব্দগুলি আজও কুড়মালিতে

ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু বাঙলাতে এর ব্যবহার দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য "বিদ্যাপতি ছিলেন মৈথিলী, তাঁহার ভাষা ছিল সাধারণ বাঙালীর কাছে অবোধ্য।" বিদ্যাপতির পদ বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "ব্রজবুলিতে বিকৃত বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙলায় এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, বিদ্যাপতি যে আসলে বাঙলার কবি নহেন, মিথিলার কবি, বাঙালী ক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল।" "বাঙালির ছেলেরা মিথিলায় গিয়া সংস্কৃত তো পড়িতই, মৈথিলিতে রচিত গানও তাহারা শিখিত।"

পুরো বৈষ্ণব সাহিত্য ও পদাবলী সৃষ্টির পিছনে ব্রজবুলিও এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বিরাট ভূমিকা ছিল। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির ভাষা ও পদের অনুকরণে ২২ খানি গীত রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় বাঙালী গবেষকগণ বিদ্যাপতি ভিন্ন অন্যান্য ঝুমুর কবিদের রচনায় সর্বত্র বাংলার প্রভাব লক্ষ্য করেন। কুড়মালি স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্বকে এঁরা স্বীকার করেন না অথচ এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় ঝুমুর সাহিত্যের আদি অন্ত কুড়মালি ভাষার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। অথচ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক মহাকবি বিনন্দ সিং-এর রচনায় সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজে পান না। এবং যেহেতু কুড়মালি ভাষা বাংলার সঙ্গে মিলে না সেই হেতু শব্দ ব্যবহারে ভুল দেখতে পান। তাঁর নিজের কথাতেই আসা যাক—

"বিনন্দ সিংয়ের পদগুলির অর্থ সর্বদা খুব স্পষ্ট নহে, ইহার কারণ সম্ভবত তিনি বাঙালী নহেন, বাংলা ঝুমুরের অনুকরণে পদগুলি রচনা করিয়াছেন। অনুকরণ করিবার ফলেই ভাব সুস্পষ্ট এবং শব্দ ব্যবহার নির্ভুল হইতে পারে নাই। এই কথা পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অনেক কবি সম্পর্কেই বলা যায়।"

বিদ্যাপতির প্রসঙ্গান্তরে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের"

আলোচনায় আসতে পারি। বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। এবং চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিলেন এবং তাঁর গান এই অঞ্চলে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা ও সুরে আঞ্চলিক ভাষা ও রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। ঝুমুরের একটি জনপ্রিয় সুর ভাটিআরির উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাটিআরি, ঝুমুরের ভাটিআরি ও পূর্ব বঙ্গের ভাটিআরি একই কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। আবার ভাটির গান ভাটিআরি মালভূমি ও পার্বত্য শঙ্কুল ঝাড়খণ্ডে কি ভাবে সৃষ্টি হলো তা চিন্তার বিষয়। তবে বহুকাল আগে, পাল ও সেন যুগে ও তার পূর্ববর্তীকালে যে এই অঞ্চল নদীমাতৃক ছিল এবং এখানকার নদীগুলি যে বিশেষভাবে নাব্য ও পরিবহনের উপযোগী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ভাটিআরির সৃষ্টি অযৌক্তিক নয়। নদীর মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগের ফলে পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল তা বলা যায়। এই ভাটিআরি মূলতঃ এক হলেও পরবর্তীকালে বহুকাল যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় সুরের ও প্রকৃতির পার্থক্য ঘটেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও আঞ্চলিক কুড়মালি ভাষার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। সুরের দিক থেকেও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলার লোক সাহিত্য" গ্রন্থে ঝুমুরের উদাহরণ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বংশীখণ্ডের সুরের মিল দেখিয়েছেন, তা উদধৃত করা হল —

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নবঘন মেঘ ডাকে
বিজুলি চমকি লাগে ডর
চল যাব ঘর।
কদম তলায় নিশি হলো ভোর।
একড়া কদমের তলে কৃষ্ণ ঘুমালো কোলে
বাঁশীটি তো নিয়ে গেল চোরে
না জানি শ্যাম ঘুমের ঘোরে।

একশো একুশ

বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস যাঁর কথাই বলা হোক না কেন, এঁদের জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি ছিল তাঁদের আঞ্চলিক ভাব, ভাষা ও সুরের প্রয়োগ দক্ষতায়। পরবর্তীকালে বহু বাঙালী কবি গীত রচনার ক্ষেত্রে ঝুমুরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার মধ্যে নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নজরুল বহু ঝুমুর রচনা করেন. তবে এগুলিকে ঠিক ঝুমুর না বলে ভাব ভাষা ও সুরে ঝুমুরের অনুকরণ বলা যেতে পারে। বহু প্রচলিত গীতকেও তিনি হুবহু তাঁর রচনায় নিয়েছেন।

শেষ কথা

সাম্প্রতিককালে শহুরে গীতিকার ও শিল্পীরা ঝুমুরের সুরে অনেক গান নিজেদের বলে চালিয়েছেন। ঝুমুর নিয়ে ব্যবসাও চলছে, ব্যবসায়িক ফিল্ম ও যাত্রায় ঝুমুরের প্রসার ও প্রচার হোক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তা যেন হয় অবিকৃতভাবে এবং ঝুমুরশিল্পী বা গীতিকার যেন মর্যাদা পায়।

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে সি. সি. সি.-এর উদ্যোগে পুরুলিয়া শহরে ঝুমুর শিল্পীদের একটি সমাবেশ হয়েছিল। এই সমাবেশে বহু শিল্পীই গান ও সুর আত্মসাৎ করার নানা ঘটনা উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

ঝুমুব শিল্পীদের এই অভূতপূর্ব সমাবেশে বিভিন্ন ঝুমুর গীত পরিবেশিত হয়েছিল। সুর বৈচিত্র্যে, বিষয় বৈচিত্র্যে ঝুমুর যে একটি অনন্যসাধারণ সঙ্গীত তা সকলেই স্বীকার করেন। রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ঝুমুর লোকসঙ্গীতের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বিভিন্ন ঝুমুরের নমুনা উপস্থিত করে একথাই বলতে চেয়েছি, ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনের কথা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা এই অনন্যসাধারণ লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা অন্য কোনও ভাবে প্রকাশিত হয় নি। ঝুমুর এ অঞ্চলের সত্যিকার লোকমাধ্যম, যা চির প্রবহমান। □